স্বপ্নের ঠিকানা

আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ্

স্বপ্নের ঠিকানা

আ.জ.ম. ওবায়েদুল্লাহ

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

স্বপ্নের ঠিকানা

আ.জ.ম. ওবায়েদুল্লাহ

প্রকাশক

এস.এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ :একুশে ফেব্রুয়ারী/২০১০

২য় সংস্করণ : জুন ২০১৪

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ

ডিজাইন ওয়ান লিঃ

ফোনঃ ৮৩৫০৮৪৫, ০১৯১১-৭৫০৫২০

মূল্যঃ ৬৫.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭৯০-১২০২৪৩/০১৭১১-৮১৬০০১

১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

SHOPNER THIKANA: Written by A.Z.M. Obaydullah, Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125, Motijheel Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000 and Niaz Mangil, 922 Jubilee Road, Chittagong-4000

Price : Tk. 65.00 ; US$ 2.00 ISBN 984-70241-0011-5

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ প্রকাশনা জগতে অনন্য অবদান রেখে চলছে। আমাদের শিশু-কিশোর তরুনদের মাঝে অতীত-বর্তমান এর স্মৃতিকে জাগরুক রেখে জীবন গড়ার জন্য এমন বই হাতে তুলে দেয়াই এর লক্ষ্য। বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক আ.জ.ম. ওবায়েদুল্লাহ'এর কলমে রচিত **"স্বপ্নের ঠিকানা"** এমন একটি সুপাঠ্য অনুপ্রাণন। বড় হওয়ার স্মৃতিকথা তথা আব্বু আম্মুর আদরের কথা গল্পোচ্ছলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে লেখক চিত্রিত করেছেন কেমন ছিল জীবনের শুরুটা। তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বড় হয়ে দেশ ও জাতির জন্য কি অবদান রাখা প্রয়োজন। অনেক স্মৃতিময় ঐতিহাসিক ঘটনার বৃত্ত এঁকে তিনি শিক্ষামুলক অজানা কাহিনীর আড়ালে একেঁছেন দেশ ও জাতিকে গড়ার স্বপ্ন। বিবৃত করেছেন নানান জানা অজানা প্রেক্ষাপট। জীবনের আনন্দ উৎসব যেন নিরর্থক না হয়ে বরং শিক্ষা বিস্তারের জন্য হয় ; যেমন-ঈদ উৎসব, বিজয়, সাফল্য-ব্যর্থতা, খেলা-ধুলা, হাসি-কান্নায় তাদের জীবনের প্রকৃত বিকাশ ঘটে। আমাদেরও বিশ্বাস, 'স্বপ্নের ঠিকানা' গ্রন্থটি জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি 'পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজেকে গড়ো' এ প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ করবে আমাদের তারুন্যকে, যা তাদের দেবে আলোকিত পথের দিশা। বইটি কিশোর তরুনদের আকাঙ্খা পূরণে সহায়ক হবে। বইটি ২০১০ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়। পাঠকদের চাহিদা থাকায় বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ করা হলো। পাঠকের চাহিদা পূরণ হলেই সোসাইটির প্রকাশনার সফলতা।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)

পরিচালক প্রকাশনা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার স্বপ্নময় পৃথিবীর অভিযাত্রী
মুসান্না, নূহা, নুসাইবা,
জুমাইনা আর মুয়াজ-কে।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে ওঠোঃ বিজয়ের স্বপ্ন দ্যাখো ০৭
২। এক আলো ঝলমল দিনের আশায় ১২
৩। মনের দরোজা খোলো: প্রাণে প্রাণে ঝড় তোলো ১৭
৪। স্বাধীনতা তুমি ২২
৫। ভাষা শিখি ২৬
৬। কেন পড়ি, কেন পড়িনা ৩১
৭। নানা ভাবনা এই দেশ ৩৪
৮। ঈদ যদি এমন হতো ৩৯
৯। প্রস্ফুটিত হও ফুলের সৌরভে, প্রদীপ্ত হও ইসলামের গৌরবে... ৪৭
১০। মমতার বন্ধনে সুন্দরের সন্ধানে ৫২
১১। বিজয় দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য ৬৩
১২। স্বপ্নের ঠিকানা ৬৮

www.pathagar.com

স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে ওঠো:
বিজয়ের স্বপ্ন দ্যাখো

এই লেখাটি
এই লেখাটি তাদের জন্য স্বপ্ন দ্যাখে যারা
যাদের মাঝে স্বপ্ন বসত করে
যারা বাঁচে, বাঁচতে শেখায়, নিজের জীবন দ্বারা
হাজার জীবন স্বপ্ন সফল করে।

আজ যারা ছোট, বয়স যাদের কম, ঘুমিয়ে গেলেই ওরা স্বপ্ন দ্যাখে। স্বপ্ন দেখে ওরা ঘুমায়। জেগে ওঠে স্বপ্নের শিহরণে। স্বপ্নপুরীর এক দুরন্ত বাসিন্দা ওরা। স্বপ্নময়তার মাঝে, স্বপ্ন চোখে নিয়ে, আশায় বুক বেঁধেই ওদের বড় হবার কথা। শৈশবে যে রঙিন স্বপ্ন তাকে আনন্দিত করছে বড় হয়ে সেই স্বপ্নের বাস্তবতাই ছিল তার হৃদয়ের চাওয়া পাওয়া। কিন্তু বড়ই নিষ্ঠুর, নির্মম এই বাস্তব পৃথিবী। এখানকার অসুস্থ পরিবেশ, অসুন্দর প্রতিযোগিতা ওদের স্বপ্নগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে ফেলে। ওরা পারে না জয়ের মালা পরতে, বিজয়ের স্বপ্নচূড়ায় পৌঁছাতে। যারা এভাবেই হারিয়ে গেছে- এই লেখাটি তাদের জন্য। যারা এখনো হারিয়ে যায়নি, এখনো বেঁচে আছে আশায় বুক বেঁধে- এ লেখাটি তাদের জন্য। যারা স্বপ্ন বিজয়ের সোনালী দিনের প্রত্যাশায় জাগ্রত- এই লেখাটি ওদের জন্য।

প্রতিটি শিশুরই স্বপ্ন থাকে

যে শিশুটি এখনো কিছুই বুঝে না, মায়ের দুধ যার একমাত্র খাবার, সেও কিন্তু স্বপ্ন দ্যাখে। ঘুমের ভেতর আমরা তাকে হাসতে দেখি, কাঁদতে দেখি, ভয় পেতে দেখি। আমরা দৌড়ে গিয়ে ঘুমে অচেতন স্বপ্ন-চারী শিশুকে আদর করি। আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে শিশু। বদলে যেতে থাকে তার স্বপ্ন ও সেই স্বপ্নের ধরণ, গতি-প্রকৃতি।

স্বপ্ন আসে কোত্থেকে?

স্বপ্ন আমাদের কল্পনার ফল। আমরা যা ভাবি, যা নিয়ে আশা করি, যা আমাদের চেতনাকে প্রাণিত-শাণিত কিংবা আন্দোলিত করে তাই এক সময় স্বপ্ন হয়ে আসে। এসব হচ্ছে ঘুমের ঘোরে দেখা স্বপ্নের কথা।

www.pathagar.com

আমরা কিন্তু জেগেও স্বপ্ন দেখতে পারি। আর সেই স্বপ্নই আসল 'স্বপ্ন'। এগিয়ে নেয়ার স্বপ্ন। এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। মানুষ বড় হওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে মূলত: বড়দের সহায়তায়।

মা-বাবা-ভাই-বোন-দাদা-দাদী-শিক্ষক কিংবা আত্মীয় পরিজন কেউ একজন শিশু-কিশোরের কাছে গল্প শোনায়। গল্প শুনতে শুনতে সেও হয়ে যেতে চায় গল্পের চরিত্রের মতো একজন- হাতেম তায়ী, নেপোলিয়ন, হিলারী, আর্মস্ট্রং, নিউটন, রবিনহুড, খালিদ বিন অলিদ, ওমর। সে হতে চায় বিরাট বিজ্ঞানী, কবি, রাষ্ট্রনায়ক, দুঃসাহসী নাবিক আরও কত কী? এই যে বড় হওয়ার ভাবনা, কল্পনার জাল বিস্তার করা এটাই স্বপ্ন।

যার স্বপ্ন নেই, তার কিছুই নেই। আশা নেই, ভাষা নেই, বাঁচা নেই, নেই জীবনের কোন অর্থ।

স্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন দ্যাখে মন...

আমাদের অনেক স্বপ্নই নানা কারণে ঝরে যায়। এতে আমরা কষ্ট পাই, মন ভেঙে যায়, আশাহত হই আমরা। তবুও কি মন বসে থাকে স্বপ্নহীনতায়? না, মন নতুন ভাবনায় জেগে ওঠে, নদীতে ভেসে ওঠা চরের মতোন আমাদের মনের চরায় জেগে ওঠে স্বপ্নের সব সপ্তডিঙ্গা। আশারা সব মুকুলিত হতে থাকে। মানুষের জীবনকে সাজাতে হলে তার স্বপ্নগুলোকে সাজাতে হয়। আর স্বপ্ন সাজানোর জন্য দরকার আশে-পাশের সকলের দুহাত বাড়িয়ে দেয়া মমতা, আদর, ভালবাসা, যত্ন, পরিচর্যা ও এক অনাবিল পরিবেশ। শিশু যায়েদের স্বপ্ন হারিয়ে গিয়েছিলো তার বাবার মৃত্যুর পর। ঈদের দিন পথের ধারে বসে কাঁদছিলো সে। কে দেবে তাকে নতুন কাপড়? আল্লাহর নবী (সা:) আদর করে তাকে নিয়ে এলেন ঘরে। নতুন জামা পরালেন তাকে। নিয়ে গেলেন ঈদের মাঠে। এভাবেই যায়েদের চোখে আবার জেগে ওঠলো নতুন নতুন স্বপ্ন।

এভাবে যারা বাবাকে হারায়, মাকে হারায় কিংবা থাকে অসহায় তাদের অনেকেরই শৈশবেই বড় হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যায়। এদের মাঝে অনেকেই সরকারী-বেসরকারী শিশু সদনে আশ্রয় নেয়। তাদের চোখে মুখে আবার স্বপ্ন জেগে ওঠে। এই রকম অনেকেই আবার বড় হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। যে মন স্বপ্ন দ্যাখে সে মন অসাধ্যকে সাধন করতে চায়।

www.pathagar.com

পাখীর মতো আকাশে উড়তে চেয়েছিলো রাইট ভ্রাতৃদ্বয়। ঠিকই একদিন তারা আকাশে ডানা মেলেছিলো। আজ তাদের স্বপ্নের উড়োজাহাজে চড়ে মানুষ কোথায় না ওড়ছে? স্বপ্ন থাকলেই জয় করা যায়।

বিজয়ের স্বপ্ন দ্যাখো

'আমরা করবো জয়, আমরা করবো জয়।
একদিন নিশ্চয়।' হ্যাঁ, বিজয়ের জন্য, জয়ের জন্য এভাবেই স্বপ্নের গান গেয়ে ওঠতে হয়। তোমরা নিশ্চয়ই এগানটিও শুনে থাকো-
আজকে ছোট কালকে মোরা বড় হবো ঠিক
জ্ঞানের আলোয় আমরা আলো করবো চতুর্দিক।'
এই যে বড় হওয়া ও বিজয়ের স্বপ্ন- এই স্বপ্নই প্রয়োজন সকলের। কিন্তু এই যে স্বপ্ন, এসব স্বপ্নকে সাজিয়ে নিতে হয়। বিজয়ের স্বপ্নগুলো হতে পারে এমনিতরোঃ

এক. আশাহত হয়ো নাকো তুমি.....

চলতে গেলে যেমন পথের বাঁধা সরাতে হয়, বাঁচতে গেলেও তেমনি অনেক ঝুঁকি সামাল দিতে হয়। হতাশার কালো মেঘ বাধা হয়ে এলে থমকে থাকা যাবে না। আল্লাহ বলেছেন- 'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।'যদি হই দৃঢ়-সংকল্প, যদি লক্ষ্য থাকে স্থির তাহলে বিজয় আমাদের আসবেই। Slow and steady wins the race. ধীর অথচ স্থির লোক বিজয় লাভ করবেই।
আমাদের হৃদয়ের গভীরে এই প্রত্যয় যেনো জেগে রয়, যেনো মন গেয়ে ওঠে বার বার- 'আশাহত হয়োনাকো তুমি'।

দুই. আমায় অনেক বড় হতে হবে, আকাশ ছুঁতে হবে

আমাদের অনেক বড় হতে হবে। হয়তো আমার বাবা দরিদ্র, অশিক্ষিত, চাষা কিংবা মজুর। তাতে কি? সব বড়রাই কি বড়লোক বাবার ঘরে জন্ম নিয়ে বড় হয়েছেন? নিশ্চয়ই নয়। বাবার দারিদ্র, মায়ের অশিক্ষা, বংশের অপরিচিতি- ভুলে যাও।
যে ছেলেটি মানুষের বাড়ীতে দিন মজুর হিসেবে কাজ করেছে, রাতে স্টেশনের বাতির আলোয় পড়ালেখা করেছে, অথচ এস.এস.সি.তে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে তার দিকে তাকাও। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন ও দেখেনি, কিন্তু শীর্ষে যাবার চেষ্টা করেছে। তার চেষ্টাই তাকে মহিমা

www.pathagar.com

দিয়েছে। বিজয় দিয়েছে। তুমি যদি স্বপ্ন দ্যাখো- শীর্ষে যাবার, আশা আছে তোমার বিজয়ের।

তিন. এক নাম্বার লোকটির মতো হবো

যদি প্রশ্ন করে কেউ- কার মতো হতে চাও?

বলো- হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মতো।

কারণ তিনিই সেরা মানুষ, শ্রেষ্ঠ নবী, প্রিয়তম বাবা, সুন্দরতম পুরুষ। তাঁর মতো উত্তম হতে চাই। হতে চাই উস্‌ওয়াতুন হাসানা। সর্বোত্তম আদর্শ। বলো- হতে চাই ওমরের মতো সাহসী, ন্যায় পরায়ণ, আলীর মতো জ্ঞানী, বীর লড়াকু, খালিদের মতো সেনাপতি। হতে চাই হামযার মতো শহীদ। বলো- হতে চাই আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী, রবীন্দ্রনাথের মতো কবি, শেক্সপীয়রের মতো নাট্যকার, নজরুলের মতো কবি, শেরে বাংলার মতো মেধাবী।

বলো হতে চাই- ফেদেরারের মতো, পেলের মতো, ম্যারাডোনার মতো, শচীনের মতো, জনসনের মতো, মুষ্টিযোদ্ধা আলীর মতো কিংবা ব্রাডম্যানের মতো কিংবদন্তী খেলোয়াড়। যেখানেই থাকোনা কেন- শীর্ষে থাকবে তুমি। এ যদি হয় স্বপ্ন- সেই স্বপ্নই তোমাকে নিয়ে যাবে সফলতার দ্বার প্রান্তে।

চার. আমি হবো সকাল বেলার পাখী

সব মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে আসে ভোরের পাখী। শুরু করে ডাকাডাকি। ওরা ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, পাড়া জাগিয়ে দেয়, আবার সবাইকে সরব সজাগ করে। আমি হবো তেমনি এক সকাল বেলার পাখি। আমার জাগরণে সুরুয জাগবে, আলসে লোকেরা আমাদের ঘুমুতে বললেও আমরা ওদের বলবো- তোমরা অলস, ঘুমিয়ে থাকো। আমি জাগলেই জাগবে পৃথিবী। প্রতিটি দিন আমার শুরু হবে নতুন স্বপ্ন নিয়ে। আজানের সুরে, পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙবে আমার। দিনমান কাজ আর কাজ। কাজই আমার নেশা, ভালবাসা ও চাওয়া পাওয়া। সময়ের প্রতিটি কাজ সময়েই শেষ করবো আমি। এভাবেই আজানের সুরে সুরে নেমে আসবে সন্ধ্যা। ঘরে ফিরবো আমি, নীড়ে ফেরা পাখির মতো। পড়বো মন লাগিয়ে। রাত গভীর হবার আগেই শুয়ে পড়বো আমি। স্বপ্নের কোলে মাথা রেখে, স্বপ্ন দেখে দেখে- ফুরিয়ে যাবে রাত। এভাবেই আমি হবো স্বপ্ন সফল মানুষ। জ্ঞানী, ধনী এবং স্বাস্থ্যবান শীর্ষ পুরুষ।

www.pathagar.com

Early to bed and early to rise
Is the way to be healthy, wealthy and wise.

তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই

কেউ কেউ বলেন- সাফল্য কিংবা বিজয় হলো- সোনার হরিণ। সবাই আমরা ছুটছি সেই সোনার হরিণের পিছনে। অনেকেরই কাছে 'অধরা' হয়ে থাকছে তা। রবীন্দ্রনাথ যেমন তার গানে সোনার হরিণ পাওয়ার তীব্র আকুতি প্রকাশ করেছেন, তেমনি যদি আমরা 'আদাজল' খেয়ে নেমে পড়ি- স্বপ্ন ও ইচ্ছেগুলো আমাদের বাস্তবে রূপ নেবেই।

তার জন্য চাই সাধ ও সাধ্যের যোগ। কেউ যদি হয় বকলম আর স্বপ্ন দেখে নিজের পরিবর্তন ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে তা হলে নিশ্চয়ই লোকেরা হাসবে। নিজেকে স্বপ্ন পূরণের উপযোগী করে গড়া চাই। সাঁতরে নদী পাড়ি দিতে যেমন জানা থাকা চাই সাঁতার, তেমনি জীবনের সকল ঘাটে সফলতার জন্য চাই সেই ঘাটের সাথে পরিচয়। ঠিক করো কী হতে চাও, কী করতে চাও, কী পড়তে চাও তুমি? ভাবো- এর জন্য তোমার যোগ্যতা আছে কতটুকু? কতটুকু আর বাকী? এবার- অভাব/অসুবিধাগুলো উত্তরণের উদ্যোগ নাও। লজ্জা করে লাভ নেই। জিততে হলে লড়তে হবে, লড়তে হলে লড়াইর কৌশল জানতে হবে। তারপর নিজের লক্ষ্যপাণে ছুটতে থাকো। হয়তো হেরে যেতে থাকবে তুমি, ভয়ের কিছু নেই। আবার চেষ্টা চালাও। অবিরাম ছুটে চলো। অবিরাম প্রয়াস চালাও। অবিরাম জিততে শিখো। এভাবেই চূড়ান্ত বিজয়ের পথে এগিয়ে চলো। জীবন একটাই। এটিকে জেতাতেই হবে বন্ধু। যে বীর সে একবারই মরে, বারবার জেতে। কাপুরুষ ভয়ের কাছে হেরে গিয়ে বারবার মারা যায়। এভাবেই আমরা স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠতে চাই, বিজয়ের স্বপ্ন বিভোর হয়ে ছুটে যেতে চাই সফলতার প্রান্তরে।

www.pathagar.com

এক আলো ঝলমল দিনের আশায়

হারানো দিনের কথা

বলা হয় পৃথিবীর বয়স ৫০০ কোটি বছর। মানুষের জন্য এ পৃথিবীর জন্ম। সাগর, পাহাড়, নদী, আকাশ, তারকারাজি, সবুজ বনানী, গহীন অরন্য, অসংখ্য রঙ্গীন ফুল এসব নিয়েই আমাদের পৃথিবী। এ পৃথিবীও তার চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমস্ত কিছুই মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষকে দেয়া হয়েছে জ্ঞান, ইচ্ছার স্বাধীনতা ও বিবেক। মানুষ দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছে এ তিনের সমন্বয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে। পৃথিবীতে সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সব কিছুর জন্ম দিয়েছে মানুষ।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনাকারীগণের মতে মানুষ আদিম যুগ, তাম্র যুগ, শিল্প যুগ ইত্যাদি পেছনে ফেলে বর্তমানে তথ্য যুগ অতিক্রম করছে। মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে আমরা উত্থান-পতন দেখি। একেকবার এক একটি অঞ্চলের, এক একটি জাতির উত্থান ঘটে, অপর কোন এক জাতির পতন ঘটে। মানব সমাজের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন নতুন কেউ, পুরাতনের বিদায় হয়। এমনি কয়েকটি জাতির মধ্যে আমরা গ্রীকদের, রোমানদের, পারসিকদের কিংবা ব্যবিলনীয় বা আসিরীয়দের কথা জানি। এদের উত্থান-পতনের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শক্তি ও সাহসের এক বিরাট সম্পর্ক রয়েছে। সম্পর্ক রয়েছে অপর এক বিষয়ের। আর তা হচ্ছে ব্যাপক মানবীয় গুণাবলীর।

বিগত দিনগুলোতে আমরা লক্ষ্য করি-

এক. যে জাতিই উন্নতির শিখরে গেছে তারা শিশুদের ভবিষ্যত সুন্দর করার পরিকল্পনা করেছে।

দুই. জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির পাশাপাশি উন্নত জাতি সকল নাগরিককে মানব সম্পদে পরিণত করেছে।

তিন. প্রতিটি উন্নত জাতি ধর্মকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে। নাগরিকগণ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ধর্মপ্রাণ ছিলেন।

www.pathagar.com

চার. জাতির প্রতিটি মানুষ ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতো। নতুন ইতিহাস গড়ার জন্য চেষ্টা করতো এবং জাতীয় ঐক্যের জন্য কাজ করতো। তারা পারস্পরিক হানাহানি ও অবিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকতো।
পাঁচ. ব্যক্তিগতভাবে সবাই স্বাধীনতা ভোগ করতো। কিন্তু স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের নামে দেশ ও জাতির স্বার্থ বিসর্জন দিতো না। অপর মানুষের স্বাধীনতা হরণ করতো না।

অপরদিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রতিটি জাতির ধ্বংসের প্রধান প্রধান কারণঃ

এক. তারা কেবল ব্যক্তি কেন্দ্রিক একটি সমাজ গড়ে তুলেছে। অথবা গড়ে তুলেছে বিশ্বমানবতার প্রতি দায়িত্বহীন একটি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চেতনাসর্বস্ব জনগোষ্ঠি।

দুই. ঐসব জাতি শিশুদের আগমণকে স্বাগত জানায়নি। জন্মনিয়ন্ত্রণ, শিশু হত্যা ও শিশুদের প্রতি অবহেলা ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

তিন. জাতীয় ঐক্য ছিল না। স্বার্থকেন্দ্রিকতা মানুষকে বিভক্ত করে ছেড়েছে।

চার. ধর্মীয় অনুভূতি লোপ পেয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে ধর্ম নির্বাসিত হয়েছে। অথবা ধর্মের নামে অধর্মের চর্চা করেছে।

পাঁচ. ভোগবাদিতার চরম বিকাশ ঘটছে। নারীকে পণ্য করা হয়েছে। স্ত্রী, কন্যা ও মা হিসেবে তাদের মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হয়েছে।

আজকের কথা

জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে পৃথিবী বিরাট উৎকর্ষ লাভ করেছে। মাটির মানুষ চাঁদ ছাড়িয়ে মঙ্গলে পাড়ি জমিয়েছে। ক্লোনিংয়ের মত বিস্ময়কর বিষয়কে সম্ভব করে ছেড়েছে মানুষ। পথের দূরত্ব এখন কোন বিষয় নয়। ঘরে বসেই মানুষ দেখতে পাচ্ছে পৃথিবীর অপর প্রান্তে কি হচ্ছে। দূরের প্রিয়জনের সাথে প্রতি মুহূর্তেই তার যোগাযোগ হচ্ছে।

আকাশের সীমাহীনতা, সাগরের গভীরতা, অরণ্যের দুর্ভেদ্যতা- সব কিছুকেই মানুষ জয় করে নিয়েছে। সভ্যতাগর্বী মানুষ পৃথিবীতেই কল্পনার স্বর্গ রচনা করে নিয়েছে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্রই জীবনকে সহজ করে নিয়েছে সে। এই হলো একটি চিত্র। অথচ এরই পাশাপাশি অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি। একবার ভেবে দেখোঃ

www.pathagar.com

এক. যুদ্ধ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রতি বছর পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ শিশু জীবন হারায়। ইরাক, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, ইরিত্রিয়া, আফ্রিকা সহ যুদ্ধ কবলিত এলাকার এই শিশুদের কি অপরাধ ছিল? এখনো যারা মারা যাচ্ছে, যারা আগামী দিনগুলোতে মারা যাবে- তাদের জীবন নিয়ে কি কেউ ভাবছে? এই নির্মমতার হাত থেকে শিশুদের বাঁচানোর দায়িত্ব কার? এছাড়া প্রতি বছর গণহত্যার মাধ্যমে যেসব শিশুকে হত্যা করা হয় তার দায়িত্ব কি এড়াতে পারবে বর্তমানের সভ্য দেশ সমূহ?

দুই. একদল ভোগবাদী মানুষ প্রতিদিন প্রচুর খাবার দাবার অপচয় করছে অথচ পৃথিবীর কয়েক কোটি শিশু খাদ্যাভাবে ভুগছে। ওরা বেঁচে থাকার মতো খাবারটুকুও পাচ্ছে না, লজ্জা ঢাকার জন্য, শীত থেকে বাঁচার জন্য, পরনের কাপড় কিনতে পারছে না, স্কুলে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে, মানবেতর জীবন যাপন করছে, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই তাদের, নেই অসুখ হলে একজন ডাক্তার দেখাবার, একটু ঔষধ কেনার সামর্থ। কেবল দুর্ভাগ্য ও নিয়তির কথা বলেই কি পার পেয়ে যাবো আমরা?

তিন. আমরা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নতির কথা বলছি। মানবতার কথা বলছি। আজ দেশে দেশে যত পারমাণবিক বোমা, অসংখ্য যুদ্ধাস্ত্র তৈরী হচ্ছে এগুলো কি সভ্যতার জন্য অপরিহার্য? বিশ্ব শান্তির জন্যই কি ইরাকে এভাবে ক্লাস্টার বোমা ফেলা হয়েছে? হত্যা করা হয়েছে নারী, পুরুষ ও শিশুদের?

চার. সংস্কৃতির নামে আমাদের আত্মাকে হত্যা করা হচ্ছে। নারীকে তার মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। নারীরা মা, কন্যা ও স্ত্রীর মর্যাদা সম্পর্কে বেখেয়াল হয়ে যাচ্ছে। শিশুরা মায়ের যত্ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের শিশুদের চোখের সামনে লজ্জার পর্দা আর থাকছেনা। ধর্ম জানার, মানার কথা কেউই বলছে না তাদের। এরকম এক অসুন্দর, অসুস্থ সমাজ সভ্যতার হাতে বন্দী আমাদের আগামী প্রজন্ম? কি হবে তাদের ভবিষ্যত?

পাঁচ. এক গাঢ় অন্ধকার আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। আমাদের শিশুরা সব স্বপ্ন হারিয়ে ফেলছে। তারা জানে না পৃথিবীতে কত রূপ-রস-গন্ধ আছে। কষ্ট, দুঃখ, বঞ্চনা, অভাব, গঞ্জনা, নিপীড়ন ও না পাওয়াই যেনো ওদের নিয়তি। চারিদিকের এ অন্ধকারকে তাড়িয়ে সেখানে এক আশার বন্যা, আলোকিত সূর্য- ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব কাউকে না কাউকে পালন করতে হবে।

www.pathagar.com

আগামীকাল ঃ নতুন সূর্যের দিন

আজকের শিশুই আগামী দিনের পিতা। আগামীর মুক্তির নায়ক।

যুগে যুগে যারা পৃথিবীকে মুক্তি ও স্বস্তি দিয়েছেন, মানবতাকে শৃংখলমুক্ত করেছেন, তারা প্রায় সবাই ছিলেন অসহায় ও ভাগ্য বিড়ম্বিত শিশু।

এসব শিশুরা বড় হয়ে পৃথিবীর মানুষের মুক্তির কথা ভেবেছেন, নিজেরা আলোকিত হয়েছেন এবং নিজের আলোয় অন্যকে আলোকিত করেছেন। পৃথিবীর সকল কালের সেরা মানুষটির কথাই ধরো।

তিনি আরবের জাহেলিয়াত ভরা এক বর্বর সমাজে এতিম হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। মায়ের স্নেহ বঞ্চিত হয়েছেন ছয় বছর বয়সে। দাদা ও পরে চাচার কাছে মানুষ হন তিনি। তিনি শিশু বয়সে সমাজে বিরাজিত যুদ্ধ ও হানাহানি প্রতিরোধ করার জন্য বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন হিলফুল ফুজুল বা শান্তি সংঘ। ঠিক যেনো এ যুগের রেড ক্রিসেন্ট, বয় স্কাউট কিংবা ফুলকুঁড়ি আসর।

মানুষের কল্যাণ চিন্তায় ধ্যান করেন তিনি। ধ্যানস্ত অবস্থায় তার কাছে অহী নাজিল হয়। তিনি সে অহীর জ্ঞানে আলোকিত হন। সে আলোতে এবার তিনি সাধারণ মানুষদের আলোকিত করতে থাকেন।

কিন্তু অন্ধকারের বুক চিরে এমনি এমনি একটি আলোর বিচ্ছুরণ ঘটেনি। তাঁকে এজন্য অনেক কষ্ট সইতে হয়েছে। কষ্ট তিনি সয়েছেন, গঞ্জনা সহ্য করেছেন, আহত হয়েছেন কিন্তু হতাশ হননি। একবার একটু হতাশ হয়ে দুঃখ করছিলেন।

অমনি আবার অহী এলো-

"মধ্যদিনের আলোর দোহাই নিশার দোহাই ওরে
প্রভূ তোরে ছেড়ে যান্‌নিকো কভূ ঘৃণা না করেন তোরে
অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভাল হবেরে ভবিষ্যত
একদিন খুশী হবি তুই লভি তার দান সুমহৎ।" (সূরা আদ্‌ দোহা)

তিনি ধৈর্য্য ধারণ করলেন। মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকতে থাকলেন। সমাজকে সৎ কাজের আদেশ দিলেন। অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখলেন। আর এতেই আলোর রেখা দিগন্তে ছড়িয়ে যেতে থাকলো, অন্ধকার একে একে বিদূরীত হলো। তিনি সফল হলেন একটি পরিপূর্ণ সুন্দর সমাজ গড়তে।

www.pathagar.com

সেই ঘটনা সহ বিশ্বের অতীত ইতিহাসের উজ্জ্বল দিক থেকে আমাদেরও শিখতে হবে। আজ যারা শিশু সংগঠনের ছোট্ট বন্ধু, যারা অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও হেসে হেসে ছোটদের গড়ে তোলার, নিজকে গড়ার কাজ করছে তাদের জন্য বলছি- আগামীকাল, নতুন সূর্যের দিন। অন্ধকার দূর হয়ে আলো ঝলমল করার দিন। মানুষ হত্যায় পারঙ্গম অসভ্য মানুষের চোখ খুলবার দিন। ওদের তাড়িয়ে দেবার দিন। এসো আমরা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হই, সুন্দর মানুষ হয়ে বিকশিত হই। এসো আমরা হাতে হাত রাখি, মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে প্রতিবাদ করি।

এসো, আমরা ভাঙবার কাজ বন্ধ করি, ধ্বংসের আয়োজন প্রতিহত করি।
এসো, আমরা লড়ে যাই অন্ধকারের কালো পর্দা ঠেলে আলোর সূর্যকে তুলে আনতে।
আমাদের এ যাত্রা সফল হবেই।
পূর্বাকাশে আশার আলোয় ঝলমল সূর্য জাগবেই।
সকল শিশুরা একদিন হাসবেই।

মনের দরোজা খোলো
প্রাণে প্রাণে ঝড় তোলো

আজ যারা ছোট কাল তারাই বড় হবে।

আজকের হামাগুঁড়ি দিয়ে চলা ছোট্ট সোনামনিই হবে আগামীর মস্ত বড় মানুষ। অবাক হয়ে যে পাখীকে উড়তে দেখতো সেইই হয়তো কিছুদিন পর আকাশে বিশাল বোয়িং চালিয়ে চলে যাবে নিরুদ্দেশে, হয়ে যাবে বড় বৈমানিক। এজন্যই হয়তো কবি লিখেছেন-

আজকে ছোট কালকে মোরা বড় হবো ঠিক
জ্ঞানের আলোয় আমরা আলো করবো চতুর্দিক।

....

....
আমরা হবো বিশ্ব মাঝে শ্রেষ্ঠ যে নাবিক

....
আমরা হবো বিশ্ব মাঝে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক

....
আমরা হবো বিশ্ব মাঝে শ্রেষ্ঠ বৈমানিক।

শিশু সংগঠন ছোটদের মাঝে মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছে- 'নিজকে গড়ো'। নিজকে গড়ার মন্ত্রে যারা বড় হতে চায় তাদের জন্যই আজকের যত কথা। নিজকে গড়ার ব্যাপারে সবাই একমত যে- 'পৃথিবীকে গড়তে হলে, সবার আগে নিজকে গড়ো'।

এই নিজকে গড়ার অনেকগুলো ধাপ আছে। যেমন- নিজকে জানা, নিজের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, বিশেষ পারদর্শিতা এসব কিছু আবিষ্কার করা, সেসবের বিকাশের চেষ্টা করা।

হতে আলোকিত জন, চাই আলোকিত মন

শরীর বড় হলেই মানুষ বড় হয় না, মানুষকে বড় হতে হয় মনে। বিশাল বপুর কামরান, কথাবার্তা বলে ছোট্ট শিশুদের মতো, অল্পতেই ঝগড়া ঝাঁটি শুরু করে- তাকে নিয়ে বড় কিছু ভাবা যায় না।

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্ব "জ্ঞানালোকের বিশ্ব"। এখানে জ্ঞানী গুণীদের কদর, তাদেরই রাজত্ব। বহুকাল আগে পৃথিবী চলতো- জোর যার, মুল্লুক তার -তত্ত্বে। ক্ষমতার কেন্দ্র এখন সরে গেছে। জ্ঞানী-গুনীরাই পৃথিবী চালাচ্ছে। পড়ালেখা করে, চরিত্র-শোভায় বড় হয়ে মানুষ আলোকিত হয়। এসব আলোকিত মানুষেরা পরিচালনা করে অন্যসব মানুষদের। আলোকিত জন কে? যার একটি আলোকিত মন আছে। আলোকিত মন কীভাবে তৈরী হয়? ঘরের দরোজা বন্ধ রেখে যেমন ঘরকে আলোকিত করা যায় না তেমনি আমাদের মনোজগতে বাইরের আলো না পড়লে তবে অন্ধকার হয়ে থাকে। মনের ঘরের বন্ধ দরোজা খোলা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

মনের দরোজা খোলো

ভেবে দেখো ছোট্ট বেলায় ভাইয়া কিংবা আপু যখন পড়ালেখা করতো তুমি অবাক হয়ে চেয়ে রইতে। আর ভাবতে বাব্বা! ওরা কত কিছু জানে, কত পড়া পারে, কত না জ্ঞানী! আজ কিন্তু তেমনটি আর ভাবো না তুমি। বরং তুমিও এখন অংক, বাংলা, ইংরেজী, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি সব বিষয়ে মোটামুটি জানো। সব যে জানো, এটাই কিন্তু তোমার আলোকিত হওয়ার লক্ষণ।

শরীর ভালো, সুন্দর ও সুস্থ রাখতে যেমন চাই ভালো খাবার-দাবার, নিয়মিত ব্যায়াম আর প্রয়োজনীয় বিশ্রাম, প্রয়োজন অসুখ-বিসুখে ডাক্তারের পরামর্শ ও নির্ধারিত ঔষধ। ঠিক তেমনি আমাদের মনের বাড়ীরও কিন্তু আলাদা আলাদা কক্ষ আছে। প্রতিটি কক্ষ ঠিকমতো আলো-বাতাস পেলেই আমরা পেতে পারি একটি আলোকিত মন।

মনের দরোজা খুলে দিয়ে প্রচুর আলো-বাতাসে ভরে নিতে হবে মনের ঘর।

প্রথমত: তোমাকে তোমার পাঠ্য বইয়ের পড়াগুলো ভালো করে পড়তে হবে। লক্ষ্য করলে দেখবে ছোট্ট ক্লাসের বইয়ের সম্পাদনাও রচনার জন্য এক একটি বোর্ড আছে। সেখানে সব নামী দামী লোক। সিনিয়র শিক্ষকগন। তারা বিশেষজ্ঞ। কোন ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের মন কোন ধরনের পড়া হজম করতে পারে, কোন কোন বিষয়ে তাদের জানা দরকার, কোন বিষয়টি তাদের টানে-এসব নিয়ে তারা গবেষণা করে তবেই এসব পাঠ্য বই রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

সুতরাং পাঠ্য বই পড়া হলো প্রথম কাজ। ঠিকমতো পড়বে। নোট করবে আর মুখস্তও করবে। এই হলো তোমার ঘরে প্রথম আলো।'

দ্বিতীয়ত: বাসায় যদি পাঠাগার থাকে ভালো, তা নাহলে একটি ভালো পাঠাগারের সদস্য হতে হবে। পাঠাগারে বিচিত্র সব বই থাকে। কোরআন-হাদীস থেকে শুরু করে ছোটদের জন্য কার্টুন ছড়াপত্র এসবই থাকে পাঠাগারে। এখানে পড়তে এসো। বইয়ের মাঝেও আবার ভালো মন্দ থাকে। সুতরাং আমাদের বড় কবি আল মাহমুদের ভাষায় 'বাছাই করে পড়তে হবে। এখন এত এত বই আছে যে একজন লোক সারাজীবন পড়েও কোন বিষয়ে পড়ে শেষ করতে পারবে না।' এক একটি বিষয়ে পড়া মানেই মনের একটা দরোজা বা জানালা খুলে দেয়া।

বরং, বলবো- মনের জানালার একটি একটি খিরখি দিয়ে ঘরে ঢুকবে এক একটি বিষয়। সে বিষয়ে তোমার জানার পরিধি বাড়বে। আগে যা জানতেনা তা জেনে যাবে তুমি।

তৃতীয়ত: কেবল বই নয়, জীবন থেকে আলো নাও। সূর্য থেকে যেমন পৃথিবী আলো নেয়, পৃথিবীর আলো যেমন আলো দেয় চাঁদকে তেমনি কিন্তু মানুষেরাও একে অন্যের কাছ থেকে বড় কিছু পেতে পারে। ফার্সীতে একটি কথা আছে- সোহবাতে সালেহ তোরা সালেহ কুনাত

সোহবাতে ত্বালে তোরা ত্বালেহ কু নাত.

সৎসংগে স্বর্গবাস, অসৎসংগে সর্বনাশ। সুতরাং মা-বাবা, মুরুব্বী, শিক্ষক, ভাই-বোনসহ যারা যতো আলোকিত তাদের সাথে তত গভীর সম্পর্কে গড়ে তোল। তাহলে কী হবে? জীবন আলোকিত হবে। আঁধার দূর হবে। তোমার ভালো লাগবে। অন্যদেরও ভালো লাগবে।

চতুর্থত: চোখ খুলে চারদিক দেখো। দেখার মধ্যেও কিন্তু একটি আলো আছে। একটা মজার কথা শোন। একবার এক লোক তার কাজের লোককে বললেন- যা আমাদের কালো কুকুরটা বাচ্চা দিয়েছে দেখে আয়। সে গেলো, দেখে এলো। এবার ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- কিরে কয়টা বাচ্চা? সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে

www.pathagar.com

থেকে বলল- শুনিনিতো। আর তার নিজের স্কুল পড়ুয়া ছেলেকে যখন পাঠালো এবং একই প্রশ্ন করলো সে এন্তার জবাব দিলো। "-বাবা, কালো কুকুরটা ছয়টা বাচ্চা দিয়েছে, তিনটে সাদা, দুটো কালো আর একটা না সাদা-কালো। সাদা-কালো বাচ্চাটা বেশ মায়াবী হয়েছে।" এই যে দেখার ভিন্নতা এটা গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরভাবে দেখাও কিন্তু একটি আলোকিত হওয়ার পথ। সব কিছুকেই যত্ন নিয়ে, অনুসন্ধিৎসা নিয়ে, আগ্রহ নিয়ে দেখতে শেখো। তাহলে তোমার মনের ঘর বেশী-বেশী আলোকিত হবে।

পঞ্চমত: মনের ঘরে আলো ফেলতে-খালি দেখলে চলেনা শুনতেও হয়। কী শুনবে তুমি? হ্যাঁ, বকা-ঝকা শুনতে শুনতে যখন মনটা খারাপ হয়ে গেছে তখন একটা গান শোনো- দেশের গান, পল্লী গীতি, ভাটিয়ালী, রবীন্দ্র-নজরুল গীতি কিংবা যে কোন ব্যান্ডের গান। গান শুনলে মন ভালো হয়ে যায়। তবে গানটা ভালো হওয়া চাই, হওয়া চাই বানী প্রধান।

গানে বানী থাকা চাই। কেবল যন্ত্রের ধুক-ধুকানি নয়।

কোন কোন গান আমাদের মনের ঘরকে কানায় কানায় ভরে দেয়। যেনো-

"আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল গুহার পর........।"

প্রাণে প্রাণে ঝড় তোলো

কেবল আলোকিত মানুষরাই অন্যকে ছুঁয়ে যেতে পারে। অন্য মানুষের মনে দাগ কাটতে পারে। সবাই নিশ্চয়ই টর্চ লাইট দেখেছো। ওটি জ্বালালে আমরা অন্ধকারে পথ দেখতে পাই। এজন্য টর্চকে আগে চার্জ দিতে হয়, ব্যাটারী লাগাতে হয়। মনের দরোজা খুলে যে চার্জ নিয়েছো এখন তা বিলাবার পালা।

প্রথমত: যে মানুষের সাথেই কথা বলবে, কাজ করবে সে যেনো তোমায় সব সময় মনে রাখতে বাধ্য হয়। তোমার কথা তার মনে যেনো রেখাপাত করে। সুন্দর করে কথা বলো। উত্তেজিত হয়ে নয়। বড় বড় কঠিন কঠিন শব্দে নয়। বরং সহজ সরল করে বুঝিয়ে দাও। আর অশালীন, অসুন্দর, অশুদ্ধ কথা যেনো বেরিয়ে না আসে মুখ দিয়ে। কথা হলো তীরের মতো, একবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে

www.pathagar.com

আর তা ফেরত নেয়া যায় না। Sorry বলা যায়, মাফ চাওয়া যায় কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলা যায় না।

দ্বিতীয়ত: নিজে যেমন স্বপ্ন দেখবে তেমনি অন্যদের স্বপ্ন দেখাবে। যে বন্ধুর কান ছোট তার সময়টি বড় করতে সাহায্য করবে। যে হতাশ হয়ে গেছে তার মনে আশা জাগবে। যারা ছোট থেকে বড় হয়েছেন, যারা হারতে হারতে জিতে গেছেন তাদের কাহিনী অনুপ্রাণিত করবে। এভাবেই তোমার সান্নিধ্য বন্ধুদের বড় হতে সাহায্য করবে। সাহসী মানুষে পরিণত করবে।

তৃতীয়ত: তোমরা যারা সংগঠনের বন্ধু তারা কেবল ব্যক্তি নও। তোমরা একটি মহৎ সংগঠনের কর্মী। মনে রাখবে দশের লাঠি, একের বোঝা। দশজনের একটি একটি কাজ একজন মানুষের জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। দশজনে মিলে কাজ করলে কাজ সহজ হয়ে যায়। দশজনে কাজ করলে হারলেও মন খারাপ হয় না। এজন্য বলা হয়- দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

আমরা যদি সবাই মিলে কাজ করি, কাঁধে কাঁধ মিলাই, হাতে হাতে রাখি আর পরিশ্রম করি রাতদিন। তাহলে কিন্তু অন্যদের মাঝে তার প্রভাব পড়বে। অন্যরা এর দ্বারা উৎসাহিত হবে একত্রে কাজ করতে, ভালর জন্য লড়তে, অন্ধকার দূর করতে।

আজ প্রাণে প্রাণে আলোর বনে, আজ প্রাণে প্রাণে ছড়াও জাগার গান। আর এভাবেই আলোয় আলোয় ভরো মনের ভূবন। অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দাও আলোর জোয়ার। সর্বপ্রাণ গুলো জেগে ওঠুক সুপ্ততা থেকে।

স্বাধীনতা তুমি

২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।
বছর ঘুরে এ দিবসসটি এলেই আমরা আনন্দিত হই। পুলকিত হই।
সব ক'টি জানালা খুলে যায় আমাদের বদ্ধ ঘরের ।
আলোয় আলোয় হেসে উঠে সব ক'টি নিকনো উঠোন।
ধানের গোলায়, খড়ের গাদায়, সবুজ গাছে, শান্ত পুকুরে ....
সবখানেই যেন গান- আজি কি আনন্দ, আকাশে বাতাসে.. ।
২৬ শে মার্চ, আমাদের মুক্তি, স্বস্তি ও সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ভরা দিন।

পেছনের কথা:

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমাদের এই দেশ, বাংলাদেশ, একটি প্রাচীন জনপদ।

শস্য শ্যামলা সুজলা সুফলা এই বাংলাদেশের প্রতি সব সময়ই ছিলো বিদেশীদের চোখ।

এখানে ছিলো আগে গোলা ভরা ধান, গোয়ালভরা গরু আর পুকুর ভরা মাছ।

মাছে ভাতে বাঙ্গালীরা ছিলো সুখে, শান্তিতে ও আনন্দে।

কখনো এ দেশটি শাসন করেছে সেনেরা, কখনো পালেরা। এক সময় শাসন করেছেন দিল্লীর সুলতানগন।

শায়েস্তা খাঁর আমলে এখানে টাকায় আটমন চাল পাওয়া যেতো। এখানকার 'মসলিন' কাপড় বিদেশে রপ্তানী হতো। ইউরোপের সব বড় বড় দেশ কাপড় আমদানী করতো এদেশ থেকে। এভাবেই একসময় এদেশের উপর চোখ পড়ে ব্রিটিশ বেনিয়াদের। তারা ব্যবসা করার নাম দিয়ে এ দেশে কোম্পানী খুললো। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী । তারপর এক সময় সুযোগ বুঝে দেশী চক্রান্তকারীদের সহায়তায় বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে দখল করে নিলো সবুজ বাংলাকে। ঘৃন্য এসব ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে সিরাজেরই আত্মীয় মীর জাফর আলী খান অন্যতম।

www.pathagar.com

টানা প্রায় ২০০ বছর ইংরেজ এদেশ শাসন করলো। পরাধীনতার শিকলে আটকে থাকলাম আমরা।

আস্তে আস্তে আবার আন্দোলন হলো, সংগ্রাম হলো, লড়াই হলো।

এলো স্বাধীনতা:

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?

ভারত জুড়ে আন্দোলন, সংগ্রাম হলো। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতার লড়াই শুরু হলো, আবার মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূখন্ডের দাবীতে শুরু হলো কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে। পাকিস্ত ানের দাবী।

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে 'পাকিস্ত ান' রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এলো। ভারত স্বাধীন হলো ১৫ই আগষ্ট। মনে হলো এবার মানুষ সুখী হবে, শান্তি পাবে, অধিকার পাবে।

পরাধীনতার নতুন রূপ:

ইংরেজ বেনিয়ারা বিদায় নিলো। পাকিস্তান স্বাধীন হলো। কিন্তু ভাগ্যের পরিবর্তন হলোনা বাংলাদেশের মানুষের। বাংলাদেশ তখন ছিলো পাকিস্ত ানের পূর্ব অংশ, পূর্ব পাকিস্তান। এ অঞ্চলে মানুষ ছিলো সাড়ে চার কোটি। পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলো পাকিস্তানের রাজধানী। রাষ্ট্র চলতো ওখানকার লোকদের ইচ্ছে মতো। ১৯৪৮ সালেই তারা চাইলো আমাদের উপর উর্দু চাপিয়ে দিতে। বাংলাকে প্রথমে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয় নি। বুকের রক্ত দিয়ে ১৯৫২ সালে আমরা ভাষার অধিকার পেয়েছি।

চাকরী-বাকরী-সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও হলো অনুরূপ। সব বড় বড় পদ ওদের দখলে, এখানকার মানুষ ছিলো বঞ্চিত। কল-কারখানা-দালান-কোঠা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব দিক থেকেই পূর্ব পাকিস্তান পিছিয়ে ছিলো।

শোষণ, বঞ্চনা হলে যা হয়, এ ক্ষেত্রেও হয়েছে তাইই।

১৯৬৯ সালে হয়েছে গণ অভ্যুত্থান। ১৯৭০ এ নির্বাচন হলো। নির্বাচনে জিতলো আওয়ামীলীগ। কিন্তু, পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ক্ষমতা তাদের হাতে দেয়নি।

অবশেষ শুরু হলো স্বাধীনতার লড়াই, মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস:

১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ ঘোষিত হলো 'স্বাধীনতা'।

www.pathagar.com

২৫ শে মার্চের কালো রাতে রাজার বাগ পুলিশ লাইনে নিরীহ নিরপরাধ বাংলাভাষী পুলিশ-বি.ডি.আর সদস্যদের উপর রাতের আঁধারে হামলা করলো পাকিস্তানী সেনাবাহিনী।

"যার যা আছে তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো'- এই আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলার শহর গঞ্জ-গ্রাম সর্বত্র সংগঠিত হতে লাগলো মুক্তিযোদ্ধারা। জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হলেন সর্বত্র। সাথে যোগ দিলেন- মেজর জলিল, মেজর জিয়া. এ.কে. খন্দকার সহ অন্যান্য সেক্টর কমান্ডার গন। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী থেকে পালিয়ে এসে দেশের জন্য লড়াই করতে নিরস্ত্র মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠলো মুক্তিযোদ্ধার দল।

বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষ অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়ে পালিয়ে গেলেন ভারত। ভারতীয় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিলেন তারা। ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং নিলেন, রসদ ও অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধে।

এভাবে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো।

অকুতোভয় মুক্তিসেনারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় বীর বিক্রমে লড়াই করে কোনঠাসা করে ফেলল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের।

অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল, এলো বিজয়ের সেই দিনটি। সারা বাংলায় পত্ পত্ করে উড়তে লাগলো লাল-সবুজের পতাকা, বিজয় এলো মুক্তিযুদ্ধের।

আমরা স্বাধীন হলাম, মুক্ত হলাম।

বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিলো 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামক এক স্বাধীন ভূখন্ড।

যা চেয়েছি তা পাইনি
যা পেয়েছি তা চাইনি

১৯৭১ থেকে ২০০৯। আমাদের স্বাধীনতার ৩৮ বছর পার হয়ে গেলো। আয়ুর নিরীখে ৩৮ বছর কম সফর নয়। কিন্তু আজো আমরা স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ পাইনি।

www.pathagar.com

১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি স্বাধীন পতাকা, স্বাধীন দেশ। কিন্তু দেখেছি আমরা দুর্ভিক্ষ, একদলীয় শাসন, ৩০ হাজার জাসদ নেতা-কর্মীর মৃত্যু।

১৯৭৫-এ দেখেছি রাতের আঁধারে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবায়ক, বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের স-পরিবারে সকরুণ হত্যাকান্ড।

১৯৮১-তে দেখেছি দেশের অন্যতম সফল শাসক জিয়াউর রহমান হত্যাকান্ড।

১৯৮২- থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত দেখেছি আবার সামরিক শাসন, স্বৈরাচার।

১৯৯১ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত দেশে পর পর ৪টি নির্বাচিত সরকার এসেছে।

কিন্তু এত কিছুর পরও কী আমরা সত্যিকারের স্বাধীন দেশ ও জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি?

আমাদের সাথে যাদের তুলনা হতে পারতো সেই মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড আজ উন্নতবিশ্বের সদস্য হয়েছে, আর আমরা এখনো রয়ে গেছি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়েনি ঠিকই কিন্তু দেশে জন্ম নিয়েছে শত শত কোটি পতি। সাধারণ জীবন মান বাড়েনি কিন্তু গড়ে উঠেছে প্রাসাদসম আবাসিক এলাকা সমূহ। শিক্ষার হার বেড়েছে কিন্তু বাড়েনি শিক্ষার মান।

দুর্নীতি খেয়ে ফেলেছে আমাদের জাতির বিবেক।

দেশপ্রেম হয়ে গেছে সস্তা শ্লোগান।

আর গোটা জাতিকে আমরা করে ফেলেছি শতধা বিভক্ত।

ছোট্ট বন্ধুরা।

স্বাধীনতার এই দিনে

আজ তাই এসো নতুন শপথে বলীয়ান হই।

ভালবাসি এই দেশ, মাটি ও মানুষকে।

এক হই, ঐক্যবদ্ধ হই, এক মুখী হই।

গড়ে তুলি একটি সুন্দর বাংলাদেশ, একটি সুজলা বাংলাদেশ, একটি সুফলা বাংলাদেশ। একটি আধুনিক বাংলাদেশ হোক আমাদের সাধনার লক্ষ্য।

www.pathagar.com

ভাষা শিখি

ভাষা বলে কাকে?

মানুষকে বলা হয় বাকশক্তি সম্পন্ন জীব।

মনের কথাকে প্রকাশ করতে জানে বলেই মানুষ কখনও হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো আনন্দিত হয় আবার কখনো হয় দুঃখিত। মনের সব অবস্থাকেই সে ভাষায় প্রকাশ করতে শিখেছে। পাখীরা ডালে ডালে গান গায়। কিচির মিচির ডাকে। পশুরাও নানা রকম শব্দ করে। এসব শব্দাবলী কি কোন ভাষা? ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে এসব শব্দ, ভাষা নয়।

ভাষা বলা হয় কাকে? মনের ভাব প্রকাশ পায় এমন ইশারা, ইঙ্গিত বা প্রকাশকে ভাষা বলা হয়। সে অর্থে পাখী বা পশুর ডাকও একটি ভাষা।

মানুষের ভাষা

আমরা যে ভাষার কথা বলছি তা মানুষের ভাষা। মানুষে মানুষে ভাবের আদান প্রদান হয় ভাষার মাধ্যমে। এ ভাষা আবার নানা রকম। চোখেরও একটি ভাষা আছে। গানে বলা হয়- 'চোখ যে মনের কথা বলে, চোখে চোখ রাখা শুধু নয়/ চোখের সে ভাষা বুঝতে হলে চোখের মতো চোখ থাকা চাই"। আমরা চোখ দিয়ে অনেক কথা বলি বা বুঝাই। চোখের ইশারায় কোন কোন সময় রাগ, অনুরাগ, বিরাগ প্রকাশ করি। হাতের ইশারায়ও অনেক ভাব প্রকাশ করা হয়। হাত, পা বা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানা রকম ভঙ্গি করে অনেক কিছুই বুঝাই। একে বলে দেহের ভাষা। পৃথিবীতে আমরা মানুষ আছি প্রায় ৬ শত কোটি স্বাধীন দেশ আছে ১৯৭টি। মানুষের ভাষা আছে কয়েক হাজার। আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে ৫৬টি লিখিত ভাষা আছে। অনেক ভাষা আছে যার লিখিত রূপ নেই।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে মানুষের প্রতি তাঁর নেয়ামতসমূহের কথা বলেছেন। এর মাঝে অন্যতম নেয়ামত হচ্ছে ভাষা। 'আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি আর আমি তাকে ভাষা শিখিয়েছি'- (সূরা-আর রাহমান)। ভাষা শিখার কারণেই মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক।

www.pathagar.com

ভাষা এলো কোথা থেকে?

বিজ্ঞানীদের একটি অংশ বলেন- মানুষ ধীরে ধীরে কথা বা ভাষার আবিষ্কার করেছে। প্রথমে তারা কেবল ইশারায় কথাবার্তা বলতো। পরবর্তীতে প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে ভাষা সৃষ্টি করেছে। কথাটি ঠিক নয়। আল্লাহতায়ালা বলছেন-'আমরা আদমকে সবকিছুর নাম শিখিয়ে দিলাম। অত:পর যখন বললাম-তুমি এদের নাম বলো। তখন আদম নাম বলে দিলো। 'আদম (আ:) আমাদের প্রথম পিতা, প্রথম মানুষ। তাঁকে আল্লাহ ভাষা শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে মানুষের বংশবিস্তার ঘটেছে। মানুষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছে। তারা নিজেদের মাঝে নানা ভাবের আদান প্রদানের জন্য ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান ঠিক করে নিয়েছে। এসবই হয়েছে মানুষের পরিচয়ের জন্য। কোরআনে বলা হয়েছে-'হে মানুষ, তোমাদেরকে নিশ্চয়ই এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অত:পর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে ভাগ করা হয়েছে তোমাদের পরিচয়ের জন্য।" 'এখন মানুষের অনেক গোত্র, অনেক জাতি আবার তাদের ভাষাও অনেক।

বলা হয়-এক ভাষার বুলি আরেক ভাষায় গালি। এতই বিচিত্র মানুষের ভাষা।

নিজের ভাষা

প্রত্যেক মানুষই তার মায়ের ভাষাকে ভালবাসে। যে ভাষায় মাকে ডাকে, যে ভাষায় তার হাসি কান্না প্রকাশ করতে ভালবোধ করে - সে ভাষাই মানুষের প্রিয় ভাষা। পৃথিবীর ভাষা সমূহের মাঝে বর্তমানে সর্বাধিক মানুষ কথা বলে চীনা ভাষায়, এরপর ইংরেজীতে এর পরই আরবীর স্থান, ফরাসী ভাষায়ও বহু লোক কথা বলে। সেদিক থেকে বাংলা পৃথিবীর ৭ম ভাষা। প্রায় ২৪ কোটি লোক বাংলায় তাদের হাসি কান্নার কথা ব্যক্ত করে।

সব মানুষই তার নিজের ভাষার প্রতি দুর্বল। বিদেশের মাটিতে হঠাৎ করে নিজের ভাষায় কাউকে কথা বলতে দেখলে খুশী হননা এমন লোক পাওয়া দুষ্কর। এজন্য আল্লার রসুল (স:) বলেছেন- "আল্লাহ আমাকে হিব্রু ভাষা শিখতে বলেছেন।" একজন সাহাবীকে তিনি হিব্রু ভাষা শিখে নিতে বলেছিলেন। ইহুদীদের ভাষা হিব্রু জানার মাধ্যমে তাদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়।

www.pathagar.com

ভাষায় ৪টি দক্ষতা (Skill)

প্রতিটি ভাষার ৪টি দক্ষতার বিষয় আছে।

পড়া, লেখা, বলা ও শোনা (Reading, Writing, Speaking ও Listening)- এ চারটি বিষয় সমানভাবে আয়ত্ব করতে পারলেই একটি ভাষার উপর সঠিক দখল হয়েছে বলা যায়। এ চারটির যতটিতে আমার দক্ষতা আসবে ততটাই আমি দক্ষ বলে বিবেচিত হবো।

ভাষার ক্ষেত্রে প্রথমেই কোনটি আসবে? বলা, শোনা, পড়া, লেখা-নাকি অন্য কিছু?

একটি শিশুর দিকে তাকাও। সে প্রথমেই চিৎকার দিয়ে কান্না করে। কান্না করে পৃথিবীবাসীকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানায়। তার কান্না শুনে মা ছুটে গিয়ে মুখে দুধ তুলে দেয়, তাকে কোন কিছু কামড়ালে (মশা, মাছি, পিপঁড়া) আমরা তা তাড়িয়ে দিই। কিংবা পেশাব পায়খানা করলে তা পরিস্কার করে দেয়া হয়। আবার ভয় পেলে কোলে নিয়ে আদর করা হয়। আরেকটু বড় হলে সে প্রথমে মাকে তারপর বাবা, দাদা, দাদু, এসব ডাকে। আবার এক সময় মাম্ মাম্ বলে পানি খেতে চায়। তিন্ বছর পর্যন্ত বাচ্চারা অনেক কথা বলতে শিখে। অনেক সময় বেশ সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে শিখে। এ সময় তার বুঝারও সূচনা হয়। আমাদের কথা শুনে বুঝে ও সে অনুযায়ী সাড়া দেয়। কখনও ছুটে আসে বুকে আবার কখনো পালিয়ে বেড়ায়।

প্রথম পাঠশালা: বলা এবং শোনা

এ সময় শিশুর সবচেয়ে বড় পাঠশালা তার বাসা, পরিবার ও পরিবেশ।

পরিবারের সব সদস্য তার শিক্ষক। এমনকি যে কাজের মেয়েটি বা ছেলেটি তাকে খাওয়ায়, তার সাথে খেলে, তাকে গোসল করায় তার কাছ থেকেও সে শিখে। এ সময় যদি সে বাবা-মা বড় ভাই-বোনের সাথে বেশী সময় কাটায় তাহলে বেশী ভালভাবে শুনতে, বুঝতে ও বলতে শিখে। পরিবারের সদস্যদের সবারই উচিত শিশুর সাথে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা। হ্যাঁ, তাকে না শিখালেও শুনতে শুনতে সে দেশীয় ও আঞ্চলিক ভাষাও শিখে নেবে। যেমন- বাসার কাছে ফেরীওয়ালার কাছ থেকে সে অজান্তেই তরহারী, কা ওজ, ইত্যাদি শব্দ ও ডাক শিখে নেয়।

www.pathagar.com

আমার এক প্রতিবেশীর ছেলের কথাই ধরো। তার বাবা সবসময় তার সাথে আরবী কথা বলে, তার মা বলে বাংলা ভাষায়। তার প্রতিবেশীরা বলে আঞ্চলিক ভাষায়। সে কিন্তু তিনটাতেই অভ্যস্ত। শিশুদের গ্রহণ করার ক্ষমতা অনেক বেশী। তাই ওদের কোন কষ্ট হয় না। বলা ও শোনার কাজটি আগে শুরু হয়। এজন্য প্রথম থেকেই আমাদেরকে শুদ্ধ বলা ও শোনার চেষ্টা করতে হবে। আজকাল বিভিন্ন ভাষার ওপর ছোটদের উপযোগী সিডি ও অডিও ক্যাসেট পাওয়া যায়। যাদের বাসায় এসবের আয়োজন রয়েছে তারা এর সুযোগ নিতে পারো।

লিখতে হলে

এবার হলো লেখার পালা। লেখার আগে বই চাই, খাতা চাই, কলম আর পেন্সিল চাই, চাই ইরেজার। ছবি দেখে সহজেই শিশু চিনতে পারে। এজন্য বাবা মা ও স্কুলের শিক্ষকেরা প্রথমেই ছোটদের জন্য ছবিওয়ালা বই কেনেন, চার্ট কেনেন। এক্ষেত্রে ওয়ার্ড বুকও বেশ কাজ দেয়। অক্ষর চিনার আগেই শিশু দেখে দেখে শব্দ মুখস্ত করতে পারে।

ছোটদের অক্ষর চিনার সময় থেকেই শুদ্ধ ও যথাযথভাবে অক্ষর চিনাতে হবে, সঠিক উচ্চারণ জানাতে হবে। তা না হলে ছোটরা ভুল শিখবে, ভুল বলবে এবং ভুলের উপর গড়ে উঠবে।

বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক, আরবী- প্রভৃতি শিখানোর জন্য আলাদা আলাদা খাতা লাগবে। প্রথমে ওদেরকে চার/পাঁচটি করে অক্ষর বা সংখ্যা লিখে দিতে হবে। হুবহু সেরকম লেখাতে হবে। তারপর তাদেরকে মুখস্ত লিখতে দিতে হবে। অনেক সময় ছোটরা লিখতে শিখে কিন্তু লেখার পদ্ধতি ঠিক থাকে না। যেমন ধরো 'ক'। এটি কি < দিয়ে শুরু হবে নাকি > দিয়ে শুরু হবে? ত লিখতে ৩ দিয়ে শুরু হবে নাকি ত দিয়ে শুরু হবে? - এসব ঠিকমত না শিখলে লেখা দ্রুত, সুন্দর ও ভাল হয় না।

উচ্চারণ

ভাষা শিখিতে হলে শব্দের উচ্চারণ, সিলেব্‌ল (এক সঙ্গে যতটুকু উচ্চারণ করা যায়) ইত্যাদি জানতে হয়। যারা সিলেব্‌ল ভাগ করে শব্দ শিখে তাদের সাধারণত: বানান ভুল হয় না অনেক নতুন শব্দ তারা প্রথমবার শুনেই শুদ্ধ করে লিখতে পারে।

www.pathagar.com

শব্দ শিখো বানান, উচ্চারণ ইত্যাদি শুদ্ধ করে শিখতে হলে শব্দ শিখতে হয় প্রচুর। ছোটদের ধীর ধীরে শব্দ শিখতে হবে। বেশী বেশী শব্দ প্রথমে পাখী, পশু, ফুল, ফসল, গাছ, লতা, দিন, মাস ইত্যাদির নাম শিখবে। প্রতিদিন কম পক্ষে ৫টি নতুন শব্দ শিখতে হবে। যাই শিখোনা কেন লিখবে। এখন বাজারে বেশ ভাল ভাল ওয়ার্ডবুক পাওয়া যায়। বড় হতে হতে ভাষার জন্য অভিধান ব্যবহার করতে জানতে হবে। অভিধান ভাষার সবচেয়ে বড় শিক্ষক। নিজকে গড়তে হলে প্রথমেই নিজের ভাষা শিখতে হবে।
আমাদের নিজের ভাষা বাংলা।

ভাষা শিখতে হলে আগ্রহ থাকতে হবে। চোখ কান খোলা রাখতে হবে। নিজের ভাষা শিখা হলে অন্য ভাষার দিকে নজর দেবে। শুরু হোক তাহলে ভাষা শেখার অভিযান।

www.pathagar.com

কেন পড়ি কেন পড়িনা

শৈশব থেকে পড়ি। যখন থেকে বানান করে পড়া শিখেছি তখন থেকেই পড়ি। আমার মনে হয় আমি একা নই আরও অনেকেই আশৈশব পাঠক। পড়াকে যাদের একবার ভাল লেগেছে শত বাধার মধ্যেও তারা কিছু না কিছু পড়েন। অভাবের কারনে একবেলা হয়ত খাবার কষ্ট মেনে নিতে পারেন তারা কিন্তু 'না পড়া' মেনে নিতে পারেন না।

কিন্তু কেন এই পড়া?

প্রায় সব মানুষই আনন্দের জন্য পড়ে থাকেন। এ আনন্দ জানার, এ আনন্দ অবহিত হওয়ার, এ আনন্দ মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার অংশীদার হওয়ার, এ আনন্দ আলোকিত হওয়ার, এ আনন্দ শিহরিত হওযার- এ আনন্দের কোন সীমা নেই। সীমাহীন এক আনন্দই পাঠকের প্রেরণা।

এই আনন্দকে বলা যায় রসবোধ। মানুষ সব সময়ই রসপ্রিয়। এই রসবোধ আবার মানুষে মানুষে ভিন্ন হয়। কিছু মানুষ আছেন তারা শুধু গল্প প্রিয়। গল্পের বইই তাদের সবচেয়ে প্রিয় বই। কেউ আবার বড় গল্প নয় কেবল ছোট গল্প পছন্দ করেন। কারো পছন্দ ভুতের গল্প" কল্পকাহিনী। আবার কারো ভালো লাগে বিশাল বিশাল উপন্যাস। গল্পে তাদের রোচেনা, মন ভরে না্ আরেকদল আছেন সিরিজ পাঠক। দস্যু বাহরাম, দস্যু বনহুর, কুয়াশা, মাসুদরানা, সাইমুম সিরিজ এগুলো তাদের প্রিয়। কারো প্রিয় শুধু ভ্রমণ কাহিনী। একশ্রেণীর প্রিয় থ্রিলার, সায়েন্স ফিকশন।

আরেক ধরনের পাঠক আছেন যারা গল্প-উপন্যাসকে মনে করেন সাদামাটা বিষয়। তাঁদের ঝোঁক সিরিয়াস বিষয়ে। প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সংকলন এসবই তাদের প্রিয়। বিশাল বিশাল গ্রন্থ রাজির মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তত্ব, তথ্য ও পরিসংখ্যানের সমুদ্রে অবগাহন তাদের এক দূরন্ত নেশা, প্রায়শই দেখা যাবে তারা বইয়ের সাগরে ডুবে আছেন। এ এক অদ্ভূত খেয়াল তাদের। এছাড়াও এক ধরনের পাঠক আছেন, তারা পড়েন পত্রিকা। পত্রিকার নাম, ডেটলাইন দিয়ে শুরু করে প্রিন্টার্স লাইন পর্যন্ত আদ্যপান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন এরা। হতে পারে যে পত্রিকা পড়লেন তার একটি

www.pathagar.com

খবরও তার পুরা মনে থাকেনা কিন্তু তাই বলে কি তিনি দমবার পাত্র? মোটেই নয় বরং পত্রিকাপাঠে এদের উৎসাহ রীতিমত দেখার মতো বিষয়। অবশ্য কেউ কেউ অন্য কারনেও পত্রিকার পাঠক। বাংলাদেশের কোন এক প্রেসিডেন্টকে বলতে শুনেছি তিনি নাকি দৈনিক ৩২ খানা পত্রিকা পড়েন। মনে হয় উনার প্রেস সেক্রেটারী ছুটিতে ছিলেন কিংবা উনার দিনের কর্মসূচীতে রাষ্ট্রের জরুরী কাজ খুব কমে গিয়েছিলো। কারো কারো ড্রইং রুমে পত্রিকার সংগ্রহ বেশ দেখার মতো। এর বাইরে একদল পাঠক আছেন তারা ডিকশনারী বা অভিধানের মুগ্ধ পাঠক। অভিধানের পাতায় চোখ ডুবিয়ে এরা বেশ পারেন। ক্লান্তি নেই, জড়তা নেই, বিরতি নেই।
এবার যাদের কথা বলছি এরা অন্য আনন্দে পড়েন। ডিগ্রী লাভের একটি ভিন্ন রকম আনন্দ রয়েছে। যে শ্রেণীরই হোক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচুর পড়তে হয়। এখানে নির্বাচনের সুযোগ খুব কম। সিলেবাসের নির্বাচিত বইই তাদের মূল পাঠ্য। ভাল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অংকবিদ, সাহিত্য-বিশারদ বা যে কোন বিষয়ে ডিগ্রী লাভের পর বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য প্রচুর পড়তে হয়। আরেক শ্রেণীর পাঠক আছেন তারা জানার জন্য পড়েন না, বাধ্য হয়ে পড়েন। পড়াটা তাদের রুজি-রুটির একমাত্র পথ। তাড়িয়ে তাড়িয়ে ধীরে সুস্থে পাঠের আনন্দ তাদের থাকে। মনযোগ দিতে হয় প্রচুর এরা হলেন 'প্রুফ রিডার'। পত্রিকা-প্রকাশনা সংস্থার সাথে এদের যোগ।

একজন ভাল পাঠক যেমন আনন্দের জন্য পড়েন তেমনি আলোকিত হওয়ার জন্য পড়েন। মানবসভ্যতায় গ্রন্থের ইতিহাস বহু হাজার বছরের ইতিহাস। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানও এখন একটা ডিগ্রীর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় লক্ষ-কোটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। প্রতিটি ভাষাতেই সব ধরনের অসংখ্য বই রয়েছে। সব বই পাঠক পড়তে পারবেন না। পারবেন না দুই কারনে- মানুষের আয়ূ সীমিত এবং প্রতিটি বই তার ভাল লাগেনা।

আজকাল তাই পড়ার ক্ষেত্রে 'বই নির্বাচন' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকেই কোন্ বিষয়ে কোন্ কোন্ বই পড়বেন তা জেনে নিয়ে তালিকা প্রনয়ন করে থাকেন। প্রতি বছরই নতুন নতুন মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। সচেতন পাঠক এ বিষয়ে সব সময় 'আপডেট' থাকেন।

A good book is a good friend.

www.pathagar.com

অনেকেই বইকে, পাঠ যোগ্য বিষয়কে, বন্ধু হিসেবে নেন। বই জ্ঞানের ভান্ডার, পাঠক জ্ঞানের ধারক। বই তার জ্ঞানের উৎস। ভাল পাঠক একজন জ্ঞানী। আর ভাল পাঠকের মৃত্যুতে জ্ঞানেরও মৃত্যু হয়। অন্তত: জ্ঞানের ভান্ডার হ্রাস পায়।

যে অর্থে একটি বই একজন ভাল বন্ধু সে অর্থেই একটি বই একজন চরম শত্রু। প্রতি সময়েই কিছু বই থাকে যা পাঠকের জন্য নির্মল আনন্দের উৎস হয় না। কেবলি অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। এমন কিছু বই আছে যা লোক চক্ষুর অন্তরালে পড়তে হয়। ঐ ধরনের একটি বই পড়তে কেউ দেখুক তা পাঠক চান না। এ ধরনের বইও আছে, পত্রিকাও আছে।

আমরা এসব বই বা পত্রিকা পড়ি না। পড়তে চাই না। পড়তে পারি না। একি আমাদের সীমাবদ্ধতা নাকি মূল্যবোধজনিত দায়বদ্ধতা বুঝতে হবে।

নানা ভাবনার এই দেশ

বাংলাদেশ এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়ে আজ একটি নতুন ইতিহাসের পথে ধাবিত হচ্ছে। হাজার বছরের স্বাধীনতা বুকে নিয়ে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত এক উর্বর ভূমি সমৃদ্ধ যে বাংলাদেশ তার উর্বরা শক্তি আজ এক কালো দানবের থাবায় ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। কবিতা গল্প আর প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে যে সব নদীর স্রোতধারা আর উমত্ততাকে বন্দনা করা হয়েছে, ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ভীতিপ্রদভাবে সেসবই আজ কালের স্বাক্ষীমাত্র। আজ সেসব গোচারণ ভূমি আর ধূ ধূ বালুচর!

কি লিখব এই বাংলাকে নিয়ে?

বার বার স্বাধীন হয়েও যার স্বাধীনতা হয় হুমকির সম্মুখীন, যার মানুষেরা পায় না বাক-ব্যক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতা, যার কৃষক শ্রমিকেরা পায় না শ্রমের ন্যায্য মজুরী, যার গণতন্ত্র শৈশব-কৈশরে হয় হন্তারকের নীরিহ শিকার কিইবা লেখা যায় তাকে নিয়ে? তবুও আমাদের লেখার আছে, অনেক কিছুই আছে গর্ব করার, আছে অনেক রূপকথার নায়কের কল্প কাহিনীর মতো চমৎকার লড়াইয়ের ইতিহাস। আমরা এক অত্যাশ্চর্য হৃত ঐতিহ্যের ধারক বাহক।

যদি ফিরে তাকাই এই বাংলায়

পাঠক! আসুন আমরা পিছনে ফিরি।

হাজার বছর আগে আমাদের শাসন করেছে অনেক নাম না জানা শাসকেরা। কিন্তু কোন শাসকই শান্তিতে এই বাংলা শাসন করতে পারেনি। দিল্লীর শাসকেরা বহু চেয়েছে আমাদেরকে তাদের গোলাম করে রাখতে। ওরা পারেনি। পাল-সেন-সুলতান কেউই আমাদেরকে বশ্যতার নিগড়ে বাঁধতে পারেনি। ইংরেজ পারেনি গোলামীর জিঞ্জির গলায় পরিয়ে রাখতে। আমরা রচনা করেছি ঈসা খাঁর নেতৃত্বে এক দুর্জয় ঘাঁটি। যেখানে এসে খান খান হয়েছে দিল্লীর শাসক-সুলতানদের তরবারি। আমরা গড়েছি শরিয়তুল্লাহ, তিতুমীর আর নূরুলদ্বীনদের ইতিহাস যারা গ্রাম বাংলার শান্তি প্রিয় মানুষের মনে জ্বেলেছিলো স্বাধীনতার মশাল আর লড়াইয়ের দাবানল।

www.pathagar.com

এই বাংলার সুখ, চিত্তহরি সুখ-আজো ইতিহাস হয়ে কথা বলে। এখানে এসেই বিমুগ্ধতায় হারিয়ে গেছেন ইবনে বতুতা। এখানে এসেই মানুষের হৃদয়ে বসত গেড়েছে শাহজালাল, শাহ মখদুম, শাহ পরাণ, শাহ আমানত। এখানকার মানুষের বিরল ভালবাসায় মুগ্ধ হয়েছে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, বখতিয়ার খিলজী, শায়েস্তা খান সহ অজস্র বীর পুরুষ।

আমাদের মসলিন সাতসমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে বিদেশী ললনার চিত্ত হরণ করেছিলো আর তাইতো ইংরেজ বণিক-শাসকের লোলুপ-জিঘাংসায় মসলিম শিল্পীদের হাতের আঙ্গুল খোয়াতে হয়েছে।

টাকায় আট মণ চালের ইতিহাস আমাদের। বারো মাস তেরো পার্বণ আমাদেরই সুখের বারতা বইতো। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃস্টানের সম্মিলিত প্রয়াসে যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতি আমরা গড়েছি তা আজো বিস্ময়করই শুধু নয় তুলনা রহিত। এই হলো আমাদের সোনালী অতীত, আমাদের গর্বের ঐতিহ্য।

হায় মীর জাফর!

ব্যক্তির বিরুদ্ধে, জাতির বিরুদ্ধে গাদ্দারীর ইতিহাস নতুন নয়। মানব ইতিহাসের অনেক পেছনে এর বহু নজির রয়েছে। কিন্তু বাংলার মানুষের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে নবাবীর যে খাহেশ চেপেছিলো মীর জাফর আলী খানের নিষ্ঠুর চিত্তে তার তুলনা আর নেই। বাংলাভাষায় তাই 'গাদ্দারী'র সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়ালো মীর জাফরী।

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে মীর জাফর তার অবিমৃষ্যকারিতার ফলে জাতির জন্য গোলামীর জিঞ্জির বয়ে এনেছেন এটাই শুধু নয় তিনি তার নিজের জন্যও চেয়ে এনেছেন লাঞ্জনার মৃত্যু। ইংরেজদের হাত থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লক্ষ্যে যে আন্দোলন তার সূচনা হয়েছে এই বাংলায়, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য আলাদা আবাসভূমির দাবি উঠেছে তাও এই বাংলায়। ১৯৪৭-এ যে ঐক্যের ভিত্তিতে হাজার মাইল দূরত্বের দুটি ভূখন্ড মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল তা থেকে বিচ্যুত শাসকদের হঠকারিতায় তা মাত্র পঁচিশটি বছরও অতিক্রম করতে পারেনি। আঁতুর ঘরে যেনো মৃত্যু পরোয়ানা হাজির হলো। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপর সংখ্যা লঘিষ্ঠের ভাষাকে চাপিয়ে দেয়ার যে অগণতান্ত্রিক প্রয়াস তাইই ক্রমান্বয়ে পঙ্গু করে রাখলো পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিকাশকে এবং গতি দান করলো

www.pathagar.com

শাসক বিরোধী আন্দোলন ও চেতনাকে। ৫১, ৬৬, ৬৯, ৭১ এরই ধারাবাহিকতা।

সমগ্র দেশ ও জাতি ৭০-এ এক ঐতিহাসিক রায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বকে যে আকাশচুম্বী মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে তারই ধারাবাহিকতায় ৭১-এর স্বাধীনতার সংগ্রামে অসংখ্য মানুষের আত্মদান ও প্রাণপণ লড়াইয়ের বদলায় আমরা পেলাম স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস!

গণতন্ত্র এখানেও বিকশিত হতে পারেনি।
পঁচিশ সালা গোলামী চুক্তি আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নিলো। অত্যন্ত কৌশলে আমাদের আবারো বন্দী করা হলো ৭২-৭৫। মাত্র তিন বছরে রচিত হলো এক কালো অধ্যায়। বহু দলীয় গণতন্ত্রের রুগ্ন দেহকে দলিত মথিত করে তার ঘাড়ে সওয়ার হলো 'বাকশাল' নামক একদলীয় প্রেতাত্মা, ৪টি ছাড়া সব পত্রিকা বন্ধ করে আমাদের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হলো, 'মরণ ফাঁদ ফারাক্কা' পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়ে আজো ধ্বংস করে চলেছে আমাদের সবকিছু, ভারতের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রাণ হারালো অজস্র প্রতিবাদী তরুণ। দুর্ভিক্ষ কবলিত হলো সমগ্র জনপদ। এক ভয়াবহ দুর্দিন চেপে আসলো বাংলার চতুর্দিক থেকে।

পঁচাত্তর-এর পনরই আগস্টে পটপরিবর্তন হলো

বরেণ্য জাতির জনক যেভাবে জীবন দিলেন তা নিঃসন্দেহে অমানবিক। সেদিন কি কোথাও শোকের ছায়া ছিলো? নাকি নিঝুম প্রকৃতির মতো সব অধিক শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলো? তারপর ঘটেছে অনেক ঘটনা। বারবার সামরিক শাসন এসেছে। সামরিক শাসকরা নতুন নতুন দল করেছে। গণতন্ত্র উদ্ধারের প্রাণান্ত(!) সংগ্রাম করেছেন তারা। সুবিধাবাদী, দল ছুটদের ভাগ্য পরিবর্তনের পাক্কা বন্দোবস্ত করেছেন। কত লোক যে কোটি পতি হবার সুযোগ পেলো এর মাধ্যমে। অবশেষে ১৯৯১ এসেছে। সামরিক স্বৈরাশাসকের বিদায়ের পর গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার এসেছে।
আমরা গত কয়টি বছরে যা প্রত্যক্ষ করেছি তাকে আর যাই বলা হোক গণতন্ত্র বলা যায় না। পাশাপাশি আমরা আবারও মানুষের ভোটাধিকার, ভাতের অধিকারের শ্লোগান শুনেছি। সংসদীয় গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার জন্য কেয়াটেকারের দাবী শুনেছি। এই দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ম্যারাথন হরতাল,

www.pathagar.com

অসহযোগ দেখেছি। অবশেষে যারা 'কেয়ারটেকার' মানেন না, এর অর্থ বুঝেন না তাদেরকে দেখলাম সংসদে বসে 'কেয়ারটেকার' বিল পাস করতে। এখন আবার তারা দাবী করছেন 'আমরা কেয়ারটেকার বিল' পাস করে রাজনীতি বিজ্ঞানে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছি। কোন এক সময় তারা এর স্বপ্নদ্রষ্টাও দাবী করে বসতে পারেন। ১৯৯০- এ যাকে 'স্বৈরাচার' বলে গদি ছাড়ানো হলো জেলে পুরা হলো ১৯৯৬ আসতে আসতেই কি তিনি গণতান্ত্রিক হয়ে গেলেন? তার সমস্ত অপরাধই কি স্খলিত হয়ে গেলো? পত্র-পত্রিকার ভাষায় যেনো তাইই অনুরণিত হচ্ছে। আমাদের সকলেরই একখানা শুভ্র আয়না আছে তার নাম হৃদয়। একবার বুকে হাত দিয়ে যাচাই করুন আপনি কি মীর জাফর আলী খানের রক্তের উত্তরাধিকার বয়ে চলছেন, নাকি আপনার ভেতরে সিংহ হৃদয় টিপু সুলতানের টগবেগে ঘোড়া দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে? স্বাগত টিপু! গুড বাই মীর জাফর!

এবার নতুন পানিতে সফর

পাঠক আপনি কি তরুণ? আপনার মন কি তারুণ্যে উদ্বেল? আপনি কি এই বাংলাকে ভালবাসেন? যদি তাই হয় তাহলে আপনাকে এক ইস্পাত দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনার কিন্তু অনেক কাজ। সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে 'কেয়ারটেকার সরকার' নামক যে অধ্যায়টি সংবিধানে সংযুক্ত হলো এটিই এখন আমাদের রক্ষা কবচ। আমরা যেনো কেউই এটি নস্যাত হয়ে যায় এমন কোন কাজ করে না বসি। 'কেয়ারটেকার সরকার' সংক্রান্ত যে আইনটি সংবিধানে সংযুক্ত হলো তা শত শহীদের রক্তে ছিনিয়ে আনা। হাজার জনতার ত্যাগ তিতিক্ষার ফসল। আমাদের একটি জাতিগত অর্জন এটি। আশা করি আর কোন ষড়যন্ত্র এর ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করবে না। তবুও যদি মীর জাফরের কোন প্রেতাত্মা জেগে ওঠে আপনার করণীয় কি? রুধির ধারায় সেই অন্যায়কে ভাসিয়ে নিতে হবে।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য লালন-পালন ও চর্চা ছাড়া কোন জাতি অর্থবহ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে না। বিকৃতি ও বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে সঠিক ও যথার্থ ইতিহাস খুঁজে এনে প্রতিটি তরুণকে করতে হবে ইতিহাস মনস্ক, দেশপ্রেমিক নাগরিক। আমরা কি তা হতে পারছি?

www.pathagar.com

অতীতে পারিনি, এখনও পারছি না- এইই হয়ত আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সত্যিকারের অবস্থা। তাতে কি? হতাশা-নিরাশা কিংবা সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা নয়। আজই সিদ্ধান্ত নিন। আর সে সিদ্ধান্ত হচ্ছে-
কেউই যদি দেশপ্রেমিক না হয় আমি হবো,
কেউই যদি পরমতসহিষ্ণু না হয় আমি হবো,
কেউই যদি ভালবাসতে না শেখে আমি শিখবো।

আপনার সিদ্ধান্ত আপনারই পুঁজি। এই নতুন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে খুঁজে ফিরুন সর্বোত্তম সাথীদের।

www.pathagar.com

ঈদ যদি এমন হতো

ঈদ আরবী শব্দ।
এর অর্থ আনন্দ বা মজা।
প্রতি বছর মুসলমানদের জন্য ২টি ঈদ আসে। একটানা একমাস রোজা পালনের পর আকাশে যেদিন হেসে উঠে এক ফালি বাঁকা চাঁদ- ঠিক কাস্তে টির মত- তার পরদিন আমরা যে ঈদ পালন করি সেটিই ঈদুল ফিতর, বা রোজা ভাঙার ঈদ। আর জিলহজ্ব মাসে, হাজীরা যখন দলে দলে ছুটে যান হজ্ব করতে তখন আসে কোরবানীর ঈদ বা ঈদুল আজহা।- দুটো ঈদ হচ্ছে মুসলমানদের জাতীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। রোজার ঈদ। সবচেয়ে মজার ঈদ। এবারের ঈদটা কেমন করে কাটাবে, কি কি কিনবে, কোথায় কোথায় বেড়াবে, ইত্যাকার সব বিষয় নিয়ে তোমরা কত কি ভাবছো তাই না? এতসব ভাবনার মাঝে আরেকটু ভাবনা নিয়ে এলাম আমি।

আগে রোজা তারপরে ঈদ

আমরা অনেকেই রোজা রাখি না, নামাজ পড়ি না কিন্তু খুব মজা করে ঈদের আনন্দ করতে চাই। আচ্ছা তোমরা বলো কেউ যদি নকল করে পরীক্ষা দেয়, প্রথম বিভাগে পাশ করলেও কি তার মনে আনন্দ থাকে? থাকে না। কারণ আর কেউ না জানলেও সেতো জানে প্রথম বিভাগ পেলে কি হবে সেতো পড়ালেখা জানে না। ঈদের মজা পেতে হলে যাদের বয়স হয়ে গেছে সবাইকে রমজানের রোজা রাখতে হবে। পাড়ার সবাই মিলে রোজা রাখার মজাই আলাদা। তোমাদের পাড়ায় বা স্কুলে নিশ্চয়ই সংগঠন আছে, কিংবা তুমি নিশ্চয়ই পাড়ার কোন শিশু সংগঠনের সদস্য। নাই বা হলে তাতে কি? সামনের রোজাকে সামনে রেখেওতো তোমরা একটা ক্লাব বা সংগঠন করতে পারো। আর তা না পারো বন্ধুরা একসাথে পরিকল্পনা করতে।

বন্ধুরা সব কিছুরইতো একটা প্রস্তুতি লাগে।
রমজানের রোজা পালনের একটা প্রস্তুতি নিয়ে নাওনা।
এক. রমজান মাসে ব্যবহার করার জন্য এক বা দুটো সুন্দর টুপি-যোগাড় করো।

www.pathagar.com

দুই. রোজার বিষয় আশয়গুলো জেনে নাও। রোজার নিয়ত, ইফতারীর দোয়া, কি করলে রোজা ভেঙে যায়, রোজায় কি কি করা যায় আর কি কি করা যায় না।

তিন. সেহরী ও ইফতারীর সময়ের ক্যালেন্ডার যোগাড় করো। বাসার সবাইর সাথে সেহরী ও ইফতারীর সময় জাগানো ও মনে করে দেয়ার কাজটা তুমিও করবে বলে ঠিক করো।

চার. রমজানে নামাজ আদায়, কোরআন তেলাওয়াত, বই পড়া ইত্যাদির একটা রুটিন করে নাও।

পাঁচ. কয়েকজন বন্ধু মিলে একসাথে এসব করা যায় কিনা তা ভেবে দেখো।

এসো চাঁদ দেখি; রোজার চাঁদ, ঈদের চাঁদ

আমাদের বাড়ীতে যদি কোন মেহমান আসার কথা থাকে তাহলে আমরা কি করি? হঠাৎ গাড়ীর শব্দ পেলে জানালায় ছুটে যাই- এই বুঝি এলো। দূর থেকে কাউকে আসতে দেখলে আন্দাজ করতে চেষ্টা করি সেই মেহমান কিনা। ছাদে উঠে, গাছের ডালে উঠে দূরের কাউকে দেখলে মেহমান মনে করাতো বেশ পুরনো কথা। রমজান মাসটিও আমাদের জন্য বিরাট মেহমান। মেহমান যেমন বাড়ীর জন্য বরকত রমজানও আমাদের জন্য রহমত, বরকত আর ক্ষমার মাস। আরবী শাবান মাসের পরই আসে রমজান। এজন্য শাবান মাসের শেষে দল বাঁধি আসো রমজানের চাঁদ দেখার জন্য। রসুল (স:) বলেছেন- 'তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ, চাঁদ দেখলে তা ভাঙো।' প্রিয় মেহমানদের দেখলে যেমন আমরা খুশীতে নেচে উঠি তেমনি করে রমজানের নতুন চাঁদ দেখে আমাদের মন ভরে উঠতে হবে। রমজানের চাঁদ দেখেই আল্লার কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ যেনো আমাদেরকে রমজানের সারাটা মাস সুস্থ রাখেন, প্রতিটি রোজা ঠিক মতো পালন করার তৌফিক দেন। সারা মাস রোজা রেখে আবার আমরা চাঁদ দেখতে জোট বাঁধবো। এবারও আকাশে দেখবো একফালি রূপালী চাঁদ। আবার আনন্দিত হবো। গেয়ে উঠবো ঈদের গান- ও মন রমজানেরই রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।

রোজার দিনে

সেই যে প্রথন দিন চাঁদ দেখলে, রোজার চাঁদ দেখেই আনন্দে ছুটে যাবে মসজিদে। জামাতের সাথে মাগরিব নামাজ পড়ে জানতে হবে এশার জামাত কয়টায়, তারাবিহ্ শুরু হবে কয়টায়। প্রথমদিন থেকেই মসজিদে গিয়ে একজামাতে এশার নামাজ ও তারাবিহ্ আদায় করে ঘরে ফিরবে। তারপর সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়বে। রমজানের সূচনা হয় তারাবিহ্ নামাজ দিয়ে। তারাবিহ্ আদায় না করলে রোজা সম্পূর্ণ হয় না। বাসায় ঘড়িতে এলার্ম বেজে উঠুক কিংবা বড়রা উঠে হাঁড়ি পাতিল নাড়াচাড়া করতে যেয়ে শব্দ করুক অথবা পাড়ার ছেলেরা দলবেঁধে যে সেহ্রীর গান গায় সে গান কানে বাজুক- তুমি উঠে এসো। উঠে এসো সেহ্রী খাবার জন্য। সবার সাথে বসে সেহ্রী খেয়ে রোজার নিয়ত করে ফেলো। সেই বিখ্যাত গানটি কি তোমাদের মনে আছে?

ঘুম থেকে কেউ ডাকলো না যে তাকে

....

সেই জেদী কিশোরটির মতো তোমাকেও সেহ্রী খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে হবে, সেহ্রী খাওয়ার পর সোজা চলে যেতে হবে মসজিদে ফজর নামাজ আদায়ের জন্য। নামাজ আদায়ের পর ভোরের হিমেল হাওয়ায় একটু হেঁটে বাসায় ফিরো।

সারাদিনে আমাদের কতগুলো কাজ করতে হবে-

এক. সময় মতো মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করতে হবে। বিশেষ করে তারাবীহ্ নামাজ

দুই. সেহ্রীহ্ খাওয়ার পর বা ইফতারীর আগেভাগে বা অন্য একটা সুবিধাজনক সময়ে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে। যারা পারো পুরো রমজানে কমপক্ষে এক খতম কোরআন পড়বে।

তিন. নিয়মিত পাঠ্য বই পড়বে।

চার. আব্বু-আম্মুর কাজে কিছু কিছু সাহায্য করবে।

পাঁচ. যাই পারো, প্রতিদিন কমপক্ষে একজন রোজাদারকে ইফতার খাওয়াবে।

ছয়. বাসার সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। কাজের লোকদের সাথে তো খুবই ভাল ব্যবহার করতে হবে।

www.pathagar.com

যা করা যাবে না

এক. রোজা রেখে মিথ্যা কথা বলা যাবে না। কাউকে গালি দেয়া যাবে না। মেজাজ গরম করে কষ্ট দেয়া চলবে না। প্রকাশ্যে কোন কিছু খাওয়া যাবে না। যদি তুমি রোজা না রাখো তবে লুকিয়ে খাবার খাবে।

দুই. রোজা রেখে ঝগড়া করা যাবে না। কেউ মারতে আসলে তাকে বলতে হবে ভাই আমি রোজা রেখেছি,
আমি রোজাদার।

তিন. কেউ কিছু চাইলে- হোক তা একটা টাকা, দুটো রুটি, একবেলা ভাত- মুখের উপর না করে
দেয়া যাবে না। সামর্থ থাকলে দেয়াই দরকার। কারন রোজার মাসে ১ টাকা দিলে কমপক্ষে ৭০ গুন সওয়াব পাওয়া যাবে।

রমজানের সবচেয়ে বড় নেয়ামত আল কোরআন

তোমরা সবাই জানো রসুলুল্লাহ (রঃ) বলেছেন- 'রোজাদারের মুখ থেকে মেশকের সুঘ্রাণ- বের হতে থাকবে। রমজান মাসে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক নেয়ামত। এর ভেতর একটি হলো লাইলাতুল ক্বদর বা মর্যাদার রাত্রি। আমরা যাকে বলি শবে ক্বদর। রমজান মাসের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাত্রিগুলোর মাঝেই আছে এই রাত। আমরা অবশ্য সাতাশে রমজান দিবাগত রাতকেই শবে কদর হিসেবে পালন করি। আল্লাহ বলেছেন- 'নিশ্চয়ই আমি মর্যাদার রাত্রিতে নাজিল করেছি আল কোরআন। তুমি কি জানো সে মর্যাদার রাত কি? মর্যাদার রাত হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।"

অতীতের নবীদের উম্মতেরা শত শত কিংবা হাজার বৎসর বাঁচতো, তারা অনেক নেকী আদায়ের সুযোগ পেতো। এসব শুনে সাহাবীরা বললো "ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা তো অতদিন বাঁচবো না, তাদের তুলনায় আমাদের পুন্যতো কম রয়ে যাবে।' একথা শুনে আল্লার নবী বললেন- 'দেখো, আমার উম্মতের জন্য প্রতি বছর রমজানে রয়েছে এমন এক রাত যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।"

কিন্তু এ রাতটির এত মর্যাদা কেনো?

হ্যাঁ, এই সেই রাত যে রাতে আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় হযরতের কাছে প্রথম কোরআন নাজিল করেন। কোরআন মানুষের জন্য আল্লার শ্রেষ্ঠতম

www.pathagar.com

নেয়ামত। কোরআন নাজিলের রাত বলেই এ রাতের এত মর্যাদা। রমজান মাস, শবে কদ্বর- দুটোই মর্যাদাবান হয়েছে কোরআনের ছোঁয়ায়। তাই আল কোরআনই হচ্ছে রমজানের সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

ঈদের কথা শুনলেই আমরা খুব খুশী হয়ে যাই।
মাথায় কত চিন্তা, কি করে সুন্দর একটা ঈদ পালন করা যায়। কি কি কাপড় কিনতে হবে, জুতোটা কেমন হবে, কয় সেট কাপড় কিনবে, ঈদের দিনে কি কি প্রোগ্রাম করবে, কাদের কাদের বাসায় বেড়াবে, বাসায় যারা বেড়াতে আসবে ওদের জন্য কি গিফট কিনবে- এমন হাজারো চিন্তা মাথায় আসে তাই না?

একবার ভাবো
তুমি তো বাংলাদেশের সুন্দর পরিবেশে বসে নিজের জন্য, ভাই-বোনদের জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য এসব ভাবছো। কিন্তু যারা তোমাদেরই পাশে বস্তিতে থাকে, রাজপথ যাদের বাড়িঘর, ফুটপাত যাদের চব্বিশ ঘন্টার ঠিকানা, যারা দু'বেলা খেতে পায় না, এক মুঠো ভাতের জন্যে ঘুরে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে, অসুখ হলে যাদের কোন ভাল খাবার জোটে না, ডাক্তারের দেখা মিলে না, একডোজ ঔষধ পায় না, যাদের পরনে শত ছিন্ন ময়লা কাপড়, কিংবা যারা চেয়ে চেয়ে দেখে থাকে রং ঝলমলে পোষাক পরা তোমাদের প্রতি- এবারের ঈদ ওরা কিভাবে পালন করবে?

রমজানের রোজা শেষে তুমি যখন নতুন কাপড় পরে হৈ-হুল্লুড় করতে করতে সবাইকে নিয়ে ঈদের মাঠে যাবে ওরা তখন পথের পাশে অবহেলায় অনাদরে পড়ে থাকবে, এ কথা ভাবতে তোমার কি একটুও কষ্ট হয় না? এদের কথাতো ভাবলে, এবার একটু ভাবো দূরের বন্ধুদের নিয়ে। সেই সুদূরের দেশে যারা প্রতিদিন বাঁচার লড়াই করছে, যুদ্ধ আর বিভীষিকার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হচ্ছে ওদের। একবার ভাবো রামাল্লার অসহায় শিশুদের কথা, ফিলিস্তিনের হাজার হাজার অসহায় শিশু যাদের কারো বাবা মারা গেছেন, মা হারিয়ে গেছে যুদ্ধে, নিজে পঙ্গু হয়ে রয়েছে, যাদের বাড়ী ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে হানাদার ইহুদী ইসরাইলীরা। এদেরতো মাথা গুঁজার ঠাঁই নেই, মা ডাকবার কেউ নেই, বাবার আদর বঞ্চিত তারা।

www.pathagar.com

দেখো আফগানিস্তানের দিকে। সামনে রমজান, এরপরই ঈদ। অথচ ওদের ওপর চলছে নৃশংস বোমা হামলা। শিশুরা কি দোষ করেছে? ওদের হামলা করে হত্যা করা হচ্ছে, হাত, পা, চোখ হারিয়ে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে ওরা। এই কঠিন শীতে, যুদ্ধের আগুনের মাঝে ওরা কি খাবে, কি পরছে? যারা তাদের বাবা মা আত্মীয় স্বজন হারাবে তারা কোথায় গিয়ে দাড়াবে? পৃথিবীর যে দিকেই তাকাবে সেদিকেই দেখতে পাবে এইসব অসহায় শিশুদের করুন ছবি। জামা কাপড় নেই, খাবার নেই, ঔষধ নেই, বাবা নেই, মা নেই, সেই একটু স্নেহের ছোঁয়া- ওদের জন্য আছে শুধু কষ্ট, দু:খ, বেদনা, হতাশা, নিরাশা আর এক বুক যন্ত্রনা।

ওরাও যদি এমন একজন করে পিতা পেতেন

প্রিয় নবীর সময়কার কথা।

একবার ঈদের নামাজ শেষে হযরত খুশী মনে ঘরে ফিরে আসছিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই আনন্দ করছিল, ওরা হেসে খেলে ঈদের মজা করছিলো। আল্লার নবী সে সব দেখে দেখে পথ চলছিলেন। পথের মাঝে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এক কিশোর সেই রাস্তার পাশে বসে বসে কাঁদছিলো। সবার গায়ে নতুন জামা কাপড় আর তার পরনে পুরনো কাপড়। কেউ তাকে আদর করছে না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দয়ার নবী কিশোরটির কাছে গেলেন। আদর করে তাকে কাছে ডাকলেন। কিশোরটি মুখ ভার করে আছে। আল্লার নবী বললেন- কি হলো তোমার অমন মন খারাপ করে আছো কেন?

ছেলেটি বললো- কি আর করবো। আমার বাবা মুহাম্মদ (স:) এর সাথে যুদ্ধে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। শহীদ হয়ে গেছেন। তাই আজ আমি এতিম। সবার নতুন কাপড় আছে, আমার নেই, আমার ভীষন দুঃখ হচ্ছে। তাই আমি কাঁদছি।

ছেলেটির কথা শুনে প্রিয় নবীর চোখে পানি চলে এলো। তিনি তাকে সাথে করে ঘরে নিয়ে এলেন। এনেই বললেন- আচ্ছা আজ থেকে যদি মুহাম্মদ (স:) তোমার বাবা হন আর আয়েশা যদি হয় তোমার মা, তাহলে কেমন হয়? কিশোরটি এতক্ষনে বুঝে ফেলেছে- আরে এ যে স্বয়ং নবী (স:)।

আল্লার নবী মা আয়েশাকে বললেন কিশোরটিকে নতুন জামা কাপড় পরিয়ে দিতে আর তাকে ভাল করে খাইয়ে দিতে মা আয়েশা তাই করলেন।

www.pathagar.com

কিছুক্ষন পর দেখা গেলো কিশোরটি মনের সব দুঃখ ভুলে নতুন জামা পরে রাস্তার পাশে খেলছে। তার আর কোন কষ্ট নেই, দুঃখ নেই। সে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষকে পেয়েছে তার বাবা হিসেবে আর মা পেয়েছে এক অসাধারণ নারীকে। কিন্তু আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনসহ নির্যাতিত বিশ্বের ঐসব বঞ্চিত ভাগ্যহত শিশুদের বাবা হবে কে, কে দায়িত্ব নিবে তাদের মা হবার?

এমন হলে কেমন হয়?

প্রতি বছরইতো পেটপুরে সেহরী খেয়ে রোজা রাখি, ইফতারীর সময় রকমারী খাবারের আয়োজন করি, ঈদের জন্য মস্ত বড় বাজেট করি। এবার রোজায় আর ঈদে আমরা একটা কাজ করলে কেমন হয়?

এক. পারার সব বন্ধুরা মিলে নিজের সামর্থ অনুযায়ী টাকা দিয়ে একটা শিশু তহবিল গঠন করবো। আর এ টাকাটা বিভিন্ন দেশের অসহায় শিশুদের খাদ্য, চিকিৎসা, বস্ত্র আর শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে। তোমার আমার কয়টি টাকা যদি একটা শিশুর মুখেও হাসি ফোটাতে পারে মন্দ কি।

দুই. বন্ধুরা দূরের জন্যতো করলে এবার বাড়ির পাশের পড়শীর খবর নেই। প্রথমেই এসো আমরা এবার কাপড় কেনার সময় আব্বুর কাছে বায়না ধরি অন্ততঃ একসেট কাপড় অতিরিক্ত কেনার জন্য। সে সাথে আমাদের যে পুরানো কাপড়গুলো আছে সেখান থেকে কিছু বাছাই করে বস্তির ধারের গরীব ছেলে বা মেয়েটির জন্য রাখো। আর ঈদের কেনাকাটা যখন করবে তখন কমপক্ষে একসেট নতুন কাপড় কিনে নাও তোমারই মতো আরেকটা বন্ধুর জন্য যার কেনার মতো কোনো সামর্থ নেই।

এসব কাপড় একা বা পরিবারের কাউকে নিয়ে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের সাথে নিয়ে বিলি করে দাও গরীব দু:খী অসহায় এতিম শিশুদের মাঝে। দেখবে মনটা তোমার আনন্দে ভরে উঠেছে। এভাবেই ঈদের দিন তোমার দেয়া কাপড় পরে যখন ছোট্ট বন্ধুটি খুশীতে হাসতে হাসতে ঈদের মাঠে যাবে- তুমি পেয়ে যাবে বিরাট সওয়াব। ওর মুখে যে হাসি ফুটে উঠলো সেই হাসিটাই যেনো তুমি ফিরে পাবে বেহেশতের বাগানে।

তিন. ঈদের দিন তোমাদের বাসায়তো কমবেশী ভাল খাবারের আয়োজন হবে। সেদিন তুমি তোমাদের পাশের গরীব বন্ধুটিকে বুকে টেনে নিয়ে কোলাকুলি করবে। তারপর ওদের নিয়ে আসবে বাসায়। নিজ হাতে ওদের

www.pathagar.com

খেতে দেবে, পেট ভরে খেতে দেবে। যদি তোমাদের বেশ সুযোগ থাকে তাহলে বস্তি থেকে পাঁচ/দশ জনকে একসাথে নিয়ে আসবে। মজা করে ওদের খেতে দেবে। ওরা যেনো ভুলে যায় তোমার আর তাদের মাঝে পার্থক্য আছে। বরং ঈদের মাঠে যেমন এক কাতারে নামাজ পড়েছো তেমনি এক হয়ে যেনো তোমারই সাথে ও খেতে পারে।

চার. ঈদের সময়ে যে কোন একদিন তোমরা ইচ্ছে করলে পাড়ায় একটা মজার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে পারো। এ অনুষ্ঠানে তোমাদের পাশাপাশি গরীব বন্ধুদেরও শরিক করবে কিন্তু। তোমাদের মতো ওদেরকে দিয়ে আবৃত্তি গান, অভিনয়, করাবে। দেখো ওদের মাঝেওতো থাকতে পারে কৈশোরের দু:খু মিঞা আর যৌবনের কাজী নজরুল ইসলাম।

এভাবে এবার ঈদের কর্মসূচী অন্যরকম করে সাজিয়ে নাওনা। এবারের ঈদ হোক আনন্দ ভাগাভাগির ঈদ, জীবনকে উপলব্ধির ঈদ, বাংলাদেশ-ফিলিস্তিন আর আফগানসহ সারা বিশ্বের অসহায় বন্ধুদের পাশে দাঁড়ানোর ঈদ।

ঈদের আনন্দ বেঁচে থাকুক হাজার দিন, হাজার মাস।

www.pathagar.com

প্রস্ফুটিত হও ফুলের সৌরভে, প্রদীপ্ত হও ইসলামের গৌরবে

এক.

- একটি ফুলের বাগান। বাহারী সব ফুলের সমাহার। রঙিন ও খুশবু সমৃদ্ধ। সেখানে গান ভেসে আসছে- আমরা সব ফুল হয়ে ফুটবো গো।
- একদল বিকশিত শিশু-কিশোর; মার্চ স্পষ্ট রাত, গান গাইছে, ছুটছে বিতর্ক করছে, পরীক্ষা দিচ্ছে, আর্তের সেবা করছে, নামাজ পড়ছে, ঈদের কোলাকুলি করছে, মেলায় ঘুরছে, দূর থেকে গানের শব্দ- আজকে ছোট কালকে মোরা বড় হবো ঠিক।

দুই.

- আমাদের প্রভু, আমাদের রব আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দর অবয়ব, জ্ঞান, বিবেক, ইচ্ছার স্বাধীনতা আর খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে।
- মানব শিশুর জন্ম হয় একটি অসহায় সত্তা হিসেবে। জন্মের পর মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং অন্যদের মাঝে সে ধীরে ধীরে বড় হয়। তার শরীর বাড়তে থাকে। মন তৈরি হয়। আত্মা জেগে ওঠে। এভাবেই সে হয়ে ওঠে মানুষ।
- মানুষ চলতে শিখে, বলতে শিখে, পড়তে শিখে, করতে শিখে। সে অনুকূল পরিবেশে হেসে-খেলে চলতে শিখে। প্রতিকূল পরিবেশে লড়তে শিখে। শিখে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সব কাজ করতে। সবচেয়ে বড় কথা সে নিজকে গড়তে শিখে- পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি ও মানব সভ্যতার একজন সদস্য হিসাবে।

তিন.

- নিজকে গড়তে হবে, বড় হতে হবে, আর অন্যকেও বড় করতে হবে।
- মানুষকে আল্লাহ সকল সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত করে পাঠিয়েছেন। এ বিশাল সৃষ্টি জগতের সকল প্রাণী, সাগর, পাহাড়, নদী, বৃক্ষ-তরু-লতা এসব কিছুকে পাঠিয়েছেন মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষের অধীন করে।

www.pathagar.com

- মানব শিশু যেন একটি ফুলের মতো। ফুলের যেমন থাকে রং, মানুষের তেমনি বাইরের দিক, সুন্দর-সুঠাম দেহ, সৌষ্ঠব, দৃষ্টিকাড়া পোশাক-আশাক। ফুলের যেমন থাকে মৌ মৌ করা সৌরভ, মানুষের তেমনি মহৎ গুণ। জ্ঞান, চরিত্র, যোগ্যতা ও সৃষ্টিময়তায় মানুষ হয় বড়।
- প্রতিটি মানব শিশু জন্মসূত্রে মুসলিম। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী। প্রকৃতির বুকে চাঁদ-সূরুজ, পাহাড়-ঝর্ণা, নদী ও সাগর যেমন এক স্রষ্টার কাছে মাথা ঝুঁকায় তেমনি সব শিশুই একই স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে জন্ম নেয়। কিন্তু তার বাবা-মা পরিবেশ তাকে ইহুদি, খৃস্টান, মুশরিক বা নাস্তিক বানায়।
- "তোমরা স্রষ্টার কোন কোন নেয়ামত করবে অস্বীকার
  যে দিকেই তাকাবে দেখবে শুধু তার নেয়ামত সম্ভার"

নিজেকে গড়তে হলে আগে জানতে হবে।

- সক্রেটিস বলেছেন, Know thy self- নিজেকে জানো।
- আরবিতে একটি প্রবাদ আছে, মান আরাফা নাকসাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু। যে নিজকে জানলো সে তার স্রষ্টাকে জানলো।
- এজন্য প্রতিটি মানুষকে নিজের পরিচয় জানতে হবে।
  - আমি কে?
  - কি আমার পরিচয়?
  - কোথেকে এলাম আমি?
  - কিইবা আমার কাজ?
  - এখান থেকে কোথায় যাবো?
  - কিইবা আমার শেষ পরিণতি?
- **মানুষকে জানতে হবে স্রষ্টার পরিচয়।**
  - আমার স্রষ্টা কে?
  - তার সাথে আমার সম্পর্ক কি?
  - স্রষ্টার ক্ষমতা কতটুকু?
  - তার কাছ থেকে কি কি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে?
  - তার কোন শরীক আছে কি?

www.pathagar.com

- **জানতে হবে নিজের দেশকে।**
  নাম, সীমানা, আয়তন, সম্পদ, নদ-নদী, জাতীয় ফল-ফুল, পাখিসহ অজানা বিষয়।
  - জানতে হবে দেশের ইতিহাস, দেশের শত্রু-মিত্রকেও জানতে হবে।
  - জানতে হবে মা, মাটি, মানুষকে।
- জানতে হবে দশকে, সমাজকে, সভ্যতাকে।
- জানতে হবে দশ দিগন্তের সব কিছুকে। এ জীবনটাই এক বিশাল পাঠশালা। সবার কাছ থেকে, সবকিছু থেকে জানতে হবে। কবির ভাষায়ঃ বিশ্বাজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র।
- জানার মাঝেই গতি, জানার মাঝেই জীবন।
- যেদিন জানার চেষ্টা বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিনই আমাদের গতি বন্ধ হয়ে যাবে।
- সেজন্যই রাসূল (সাঃ) এর কাছে আল্লাহর প্রথম বাণী 'ইকরা', পড় তোমার প্রভুর নামে।
  যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ"। তিনি এও বলেছেন, "জ্ঞান সন্ধান কর দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত"। জানতে জানতেই নিজেকে আবিষ্কার করতে হবে- কি কি প্রতিভা আল্লাহ দিয়েছেন আমাকে? কি সীমাবদ্ধতা আছে আমার?

এই করিনু পণ মোরা, এই করিনু পণ,
ফুলের মতো গড়বো মোরা মোদের এ জীবন

- মানুষের তিনটি সত্তা। দেহ, মন ও আত্মা।
- দেহ বাড়ে খাদ্যে, সুষম খাবার খেলে, নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করলে, খেলাধুলা করলে ঠিক-ঠাক মতো ঘুমালে, কমপক্ষে ছয়টি ঘন্টা শান্তি মত ঘুম হলে, ব্যায়াম করলে, অসুখ হলে ঔষধ খেলে, এভাবে শরীর বাড়তে থাকে।
- অপরদিকে মন বড় হয় জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়, আদরে, সোহাগে, পরিচর্যায়। বই পড়লে, গান শুনলে, কবিতা পাঠ করলে, সিনেমা দেখলে মন বাড়তে থাকে। মনের দরজা-জানালা খুলতে থাকে।
- আর আত্মা, আত্মা জেগে ওঠে ধর্মের ছোঁয়ায়। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, 'আমাদের আত্মাকে যদি কেউ জাগরিত করে, তা ধর্ম'।

www.pathagar.com

ধর্মের অনুশীলনই মানুষের মনুষ্যত্বকে তার পশুত্বের ওপর স্থান করে দেয়।

- এজন্যই আমাদেরকে শিক্ষা লাভ করতে হয়। বলা হয়ে থাকে মানুষকে মানুষ করার আয়োজনের নাম শিক্ষা। ইংরেজ কবি জন মিল্টন বলেছেন, "Education is the harmonious development of body, mind and soul". দেহ, মন ও আত্মার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের নাম শিক্ষা।
- ফুলের যেমন কলি মানুষের তেমনই শিশু।
- কলির যেমন যত্ন নিতে হয়, পোকা থেকে বাঁচাতে হয়, সুন্দর পরিবেশ দিতে হয়; তেমনি মানব শিশুর চাই যত্ন।
- যত্নে যত্নে সে ফুলের মতই পাপড়ি মেলাতে থাকে। ফুলের পাপড়ির মত মানব সন্তানের এক একটা শারীরিক দিক, বাহ্যিক দিক।
- ফুলের ঘ্রাণের মত, সৌরভের মত মানব শিশুরও একটা গুণ, যোগ্যতা।
- আমরা প্রায়ই শ্লোগান শুনি- অমুক ভাইয়ের চরিত্র/ফুলের মত পবিত্র।
- ফুলের ঘ্রাণ যেমন সবার জন্য, সবাইকে তা নির্মল আনন্দ দেয়, আমোদিত করে তেমনি আমাদের জীবন যোগ্যতাও পরের জন্য।
- এই জন্য নিজেকে ফুলের মত করে বিকশিত করতে হবে।
- আমি ছোট, সেই ছোট, আমি এই ভাবে একদিন বড় হব।
- "আজকে ছোট, কালকে মোরা বড় হবো ঠিক, জ্ঞানের আলোয় আমরা আলো করবো চতুর্দিক।"
- "আমরা সব ফুল হয়ে ফুটবো গো, শতদল একসাথে মেলবো গো।"

প্রদীপ্ত হও ইসলামের গৌরবে

- আজকাল সবাই 'আলোকিত মানুষ' হতে বলছে। Enlightened human being.
- কোন আলোয় আলোকিত হব আমরা?
- চাঁদ-সুরুজ সহ আলোর সকল বাহ্যিক উৎসই মেকি। আলোর প্রকৃত উৎস আল্লাহ।
- আল্লাহ মানুষকে আলোকিত করার জন্য দিয়েছেন আলোর দিশা।
  - মানুষের জীবনের জন্য আল্লাহর দেয়া একমাত্র বিধান আল-ইসলাম

www.pathagar.com

- দীন ইসলামকে আল্লাহ বিধৃত করেছেন কুরআন দিয়ে।
- কুরআনের জ্যোতিকে মানব সমাজে বাস্তবায়নের জন্য পাঠিয়েছেন নবী-রাসূল। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর নূরকে উদ্ভাসিত করেছেন।

➢ আজ আলোকিত হওয়ার নামে
- মানুষ নাস্তিক হচ্ছে, নাস্তিক কি করে আলোর দিশা পায়?
- আলোকিত হওয়ার জন্য কুরআন বিমূখ হচ্ছে।
- লাইট হাউজ ছেড়ে অন্ধ পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইসলামের গৌরবে প্রদীপ্ত হওয়ার মানে কি?

➢ ইসলামের রয়েছে একটি গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এই গৌরব ও ঐতিহ্যগুলো জানতে হবে আমাদের।

➢ ক্লাসে ক্লাসে ছাত্রদের কাছে ইসলামের সেই গৌরবজনক ইতিহাস তুলে ধরার আয়োজন কি আছে?

➢ আমরা যারা ছোট-ইসলামের পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

➢ অন্ধের হাতি দর্শনের মত আমরা একজন একভাবে ইসলামকে বুঝি। ইসলামের সঠিক পরিপূর্ণ ধারণাটা হয়ে গেলে ভাল হত।

➢ এজন্য কুরআন-হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য পড়ে এর সঠিক ধারণা লাভ করতে হবে। শুনে শুনে ইসলাম বুঝা ও মানার দিন শেষ।

➢ ইসলামের দাবি অনুযায়ী এগুতে হবে। কেবল মুখে দাবি নয় বরং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে ইসলামের খাঁটি অনুসারী হতে হবে।

➢ সোনালি যুগের সোনার মানুষদের হতে হবে ঃ

১. হতে হবে হযরত আবু বকরের মত বিশ্বাসী, আপোষহীন।
২. হযরত ওমরের মত হতে হবে বীর/ঈমান গ্রহণ/কোথায় খলিফা/শয়তান ভয়ে পালায়।
৩. হযরত আলীর মত জ্ঞানী/কি সুন্দর তার নামাজ।
৪. হযরত বেলালের মত ত্যাগী।
৫. খাব্বারের মত নির্যাতন হজমকারী।

তাহলেই- আমরা হয়ে উঠতে পারবো আলোকিত মানুষ। প্রকৃত মু'মিন। পারবো ইসলামের গৌরব তুলে ধরতে।

www.pathagar.com

মমতার বন্ধনে
সুন্দরের সন্ধানে

আমরা সবাই সুন্দরের সন্ধান করছি।
আমাদের প্রত্যেকের মনেই লুকিয়ে আছে সেই সুন্দর। কিন্তু সুন্দরকে ছাপিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সব অসুন্দর। চারদিকে যুদ্ধ, ঘৃণা, হানাহানি। শান্তি, ভালবাসা, সম্প্রীতি নামক সুন্দরেরা কোথায় যেনো পালিয়ে গেছে। সুন্দর মন, সুন্দর মানুষ, সুন্দর কথা, সুন্দর কাজ, সুন্দর হাসি, সুন্দর মুখ, সুন্দর লেখা, সুন্দর দেখা, সুন্দর চাওয়া, সুন্দর পাওয়া, সুন্দর চলা, সুন্দর ভাবা- কেবল সুন্দরে সুন্দরে এই পৃথিবীটাকে ভরে দেয়ার একটা প্রয়োজন বিরাজ করছে সবখানে।

কোথায় পাবো সেই সুন্দর? সর্বোত সুন্দর, অবিমিশ্র পবিত্র-সৌম্য কান্তিময় সুন্দরকে খুঁজে পেতে হবে আজ। তাহলেই হয়তো আবার-ফুলেরা হাসবে, পাখিরা গাইবে, তারারা জ্বলবে, মিটিমিটি আলোরা করবে ঝিলমিল।
শিশু সংগঠনগুলো মূলত: সুন্দরের মেলা সাজাবার চেষ্টা করছে।
ক্ষুধা-দারিদ্র-অপুষ্টি আক্রান্ত আমাদের শিশুদের চোখ ভরা স্বপ্ন, বুক ভরা আশা জাগানো আয়োজনে ব্যস্ত তারা।
শিশু সংগঠনের এই কাজ করতে হলে সংগঠকদের নিজেদের প্রস্তুতি নিতে হয় অনেক।

এমনি এক প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো ১৫০০ বছর আগে।
ঊষর মরুর ধূসর বুকে মানুষের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিলো।
যুদ্ধ হানাহানি মারামারি-ঘৃণা-ক্ষোভ-ক্রোধ আর কপটতায় ছেয়ে গিয়েছিলো সমস্ত জনপদ। তেমনি দিনে এক ছোট্ট তরুণের মনে জেগে উঠেছিলো আকাশের উদারতা, সাগরের গভীরতার মতো মমতার জোয়ার-এসব অসুন্দর ঠেকাতে হবে, বন্ধ করতে হবে সমস্ত অন্যায়, অবিচার। জগতে ছড়িয়ে দিতে হবে ভালবাসা স্নেহ মমতার ঢেউ। সেই ১৩ বছর বয়সেই বন্ধুদের সাথে নিয়ে গড়ে তুললো হিলফুল ফুযুল বা 'শান্তি সংঘ'। যেনো

www.pathagar.com

আজকের দিনের বয়স্কাউট কিংবা রেড ক্রিসেন্ট। আমরা সবাই জানি সেই মহান তরুণের নাম হযরত মুহাম্মদ (স:)।

বিগত শতাব্দীতে আধুনিক কালের মানুষ আবার মেতে উঠেছিলো যুদ্ধ সংঘাত আর লড়াইয়ে। যুদ্ধের ভয়াবহ থাবায় যেমনি জীবন দিয়েছে নারী পুরুষ শিশুসহ অসংখ্য বনি আদম তেমনি পিতা মাতাকে হারিয়ে এতিম হয়ে গেছে অসংখ্য শিশু কিশোর, বিকলাঙ্গ হয়েছে অনেকে, জীবনের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে তারা। এমনি সময়ে আবার সেই পুরনো চেতনায় জেগে উঠে আরেকটি মন। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল নামক লোকটি সূচনা করেন 'স্কাউট আন্দোলন'।

এভাবেই শিশুদের জন্য নানা রকম কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসেন আরো অনেকেই। উদ্দেশ্যে একটাই- শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ বিশ্ব নির্মাণ। তাদের মুখে হাসি তুলে দেয়া। ফুলের মতো সুন্দর করে ওদের গড়ে তোলার জন্য এসব আয়োজন আজো আছে, থাকবে বহুদিন, থাকতেই হবে।

কারণ, শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যত।

আর- এর জন্য চাই মমতার বন্ধনে সবাইকে বাঁধার আয়োজন, সুন্দরের সন্ধানে সূদুর যাত্রার তাগিদ।

সুন্দর মানুষ:

কেউ যদি আমাকে বলে তুমি কি ফেরেশতা সেজেছো?

আমার তখন হাসি পায়। আমি কেনো ফেরেশতা সাজতে যাবো?

আমি বলি না, কখনই আমি ফেরেশতার মতো হতে চাইনা। ফেরেশতা কখনোই মানুষ হতে পারবে না। যুগ যুগ সাধনা করেও নয়।

ফেরেশতাতো আধুনিক রোবটের মতো। যে প্রোগ্রাম বা কমান্ড তাকে দিয়ে রেখেছেন আল্লাহ ফেরেশতা তার বাইরে যেতে পারে না। একজন ফেরেশতা কেবল একটি কাজই করতে পারে। একাধিক নয়। কেবল এক ধরণের কাজ। যেমন: মৃত্যুর ফেরেশতা কেবলই আল্লাহর হুকুমে (নিজের ইচ্ছায় নয়) মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। কোন জনপদে পানি দিতে পারে না।

আর মানুষ?

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব।

www.pathagar.com

তাঁর আছে সেরা হওয়ার তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।
জ্ঞান, বিবেক ও ইচছার স্বাধীনতা।
সুন্দর এক পৃথিবীর জন্য মানুষ হিসেবে আমাদেরকে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য পুরো মাত্রায় কাজে লাগাতে হবে। সংগঠকদের দেখে দেখে যেহেতু শিশুরা শিখবে, এজন্য তাদের মাঝে এর বিপুল সমাহার হওয়া চাই।

জ্ঞানের আলোয় আলোকিত মানুষই সুন্দর মানুষ:
উৎসমতে জ্ঞান দু'ধরণের। অহী লব্ধ জ্ঞান আর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। বিপরীতধর্মিতার দিক থেকে আবার তা দুধরনের, কল্যাণময় জ্ঞান আর অকল্যাণকর জ্ঞান।
সুন্দর মানুষ মূলত: কল্যাণময় জ্ঞান অর্জন করবে।
স্যার স্ট্যানলি হলের কথাকে যদি সামনে রাখি তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। তাঁর মতে- তুমি যদি শিশুকে তিনটি R (Reading- পঠন, Writing- লিখন ও Arithmetic -গণিত) শিখাও আর অপর R (Religion) ধর্ম বাদ দাও, তাহলে তুমি একটি পঞ্চম R (Rascal) বা দুর্বৃত্ত পাবে"।
আমাদের দেশেও আলোকিত মানুষ চাই শ্লোগান দিয়ে ছেলে- মেয়েদের প্রচুর বই পড়ানো হচেছ। কিন্তু তারপরও আমরা প্রতিনিয়ত শিক্ষিত বর্বর (Educated Savage) পাচ্ছি।
আমরা টিভির পর্দায়, পত্রিকার পাতায় প্রতিদিন অসংখ্য বড় বড় মানুষের চেহারা দেখতে পাই যারা একদিন আমাদেরকে আলোকিত হতে বলতেন, পড়ালেখাও করেছেন বিস্তর। কিন্তু এখন তাদের চেহারা থেকে যেনো চক চকে একটি মুখোশ খসে পড়েছে। বেরিয়ে এসেছে অন্ধকার একটি মুখ।

কেনো এমন হলো?
কারণ তাদের কাছে সেই কল্যাণময় জ্ঞানের অভাব রয়ে গেছে।
আজ তাই- শিশুদের জন্য কল্যাণময় জ্ঞানের ডালা মেলে ধরতে হবে।
মানুষের যিনি স্রষ্টা তিনি মানুষকে আহবান করেছেন- 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে' যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন....। ... পড়ো তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি অতীব সম্মানিত। যিনি মানুষকে কলমের সাহায্যে শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন তা, যা সে জানতো না।"

www.pathagar.com

তিনিই মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হযেরত মুহাম্মদ (সঃ) কে । এই রাসূল আহবান করেছেন- 'জ্ঞান অর্জন করো দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত।' 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর- নারীর জন্য অবশ্য করণীয় ।"

আমরা নিজেরা- অহীর জ্ঞান আল কোরআন শিখবো। শিশুদের শিখাবো। সে যখন স্বরবর্ণ- ব্যঞ্জনবর্ণ শিখবে, Alphabets শিখবে , সংখ্যা গুণতে শিখবে, তখনি সে তার ধর্মকেও চিনবে। পড়তে বসলে তার মনের গভীর থেকে বের হয়ে আসবে- 'হে প্রভু আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।' উদার আকাশ, গভীর সাগর, সুউচ্চ পর্বতমালা, গহীন জঙ্গল দেখে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে প্রভু কোন কিছুই আপনি শুধু শুধু সৃষ্টি করেননি।"

শুধু কোরআন, গীতা কিংবা বাইবেল নয়, পাশাপাশি যতো সুন্দর কথামালা সাজানো জ্ঞানের উৎস , হোক তা গল্প, নাটক, কবিতা কিংবা গান, হোক তা সিডি, ভিসিডি বা ডিভিডি সব কিছুর দরোজা ওদের সামনে মেলে ধরতে হবে। এমন জ্ঞান যা তার জীবনকে কেবল আলোয় আলোয় ভরে দেবে, অন্ধকার থেকে ফিরিয়ে রাখবে। তার সাথে তাকে পরিচিত করে তুলতে হবে।

জ্ঞান যেনো তার জন্য অভিশাপ হয়ে না যায়।
'যে জ্ঞান কর্মে রূপ নেয় না সে জ্ঞান বৃষ্টিহীন মেঘ মালার মতো'। কী চমৎকার কথা। আমাদের জ্ঞান আছে কিন্তু আমরা যা জানি তা মানি না, যা বলি তা করি না। এজন্যই আমাদের সময়ে শিক্ষার ভারে পৃথিবী ন্যুজ হয়ে পড়েছে।

সুন্দর মানুষ মানে বিবেকমান মানুষঃ

আজ রঙে-বর্ণে-পোষাক-আশাকে সুন্দর মানুষরাই সবচেয়ে বেশী বিবেকহীন। অথচ মানুষকে বলা হয় rational animal বা বিবেকবান সৃষ্টি।
যারা রক্ত ঝরায়, মানুষ খুন করে, অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে খায় তারা কারা? তারাও মানুষ। কিন্তু ওদের বিবেক মরে গেছে।
দৃশতঃ মানুষে আর পশুতে তেমন তফাত নেই। হাত-পা-চোখ-কান-মুখ-খাওয়া-দাওয়াসহ অন্যান্য স্বাভাবিক কাজ কর্মে মানুষে কুকুরে অনেক মিল। এমনকি জন্মদান প্রক্রিয়ায়ও। তাহলে প্রভেদ কোথায়? মানুষ কাজে-কর্মে

www.pathagar.com

তার হুঁশ (বিবেক)কে কাজে লাগায়, পশু লাগায় না। পাশবিক দিক থেকে যত মিল হৃদয়ের দিক থেকেই ততই অমিল। মানুষও খায় পশুও খায়, তফাৎ হলো পশু কাঁচা খায়। মাটিতে ফেলে রাখলেও খায়, বিষ্ঠাও খায় কিন্তু মানুষ রান্না করে, সুন্দর পরিচ্ছন্ন করে খায়। বিষ্ঠা ইত্যাদি পরিহার করে। আর এ পার্থক্য করার কাজটি করে তার বিবেক।

আমাদের বিবেককে জাগ্রত রাখতে পারলেই আমরা মানুষ। বিবেক রহিত হয়ে গেলেই আমরা পশুর মতো হয়ে যাই। বরং তার চেয়েও অধম হয়ে পড়ি।

আল্লাহ একথাই বলেছেন-'ওদের অবস্থা পশুর মতো বরং তারা পশুর চেয়েও অধম।'

পশুরা কী কখনো যুদ্ধ করে? স্বজাতিকে ধ্বংস করে? ওরা কী জনপদ উজাড় করে? বন জঙ্গল ধ্বংস করে? অন্যেরটা মেরে খায়? প্রকৃতির বিধান লংঘন করে?

এক কথায় সব কটি প্রশ্নের জবাব- না।

কিন্তু মানুষ নিয়মিতই অনিয়ম করে।

এরি পরিনতি "Global warming"। প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতা।

আমাদের প্রতিটি কাজ বিবেক সম্মত হওয়া চাই। হওয়া চাই যৌক্তিক। বুদ্ধিমান হলেই বিবেকবান হওয়া যায় না। এজন্য চাই জাগ্রত সত্ত্বা।

আমরা আমাদের শিশুদের সত্ত্বাকে জাগিয়ে তুলতে চাই। চাই ওদের বিবেকের দরোজায় কারাঘাত করতে।

একইভাবে চাই ইচ্ছার স্বাধীনতাকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করার মান সম্পন্ন মানুষ। আমাদের স্রষ্টা চাইলে মানুষকে সূর্যের মতো, সাগরের মতো, পাহাড়ের মতো অন্য প্রাণীদের মতো স্বাধীনতা ছাড়াই বানাতে পারতেন। নিয়মের শক্ত বাঁধনে আটকে রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন-হালাল-হারাম, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ঠিক-বেঠিক সহ সকল বিষয়। এও জানিয়েছেন কোন কাজ করলে কী প্রতিদান। পুরস্কার ও তিরস্কার বিষয়টিও পরিস্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন, তারপর তাকে দিয়েছেন ইচ্ছার স্বাধীনতা।

অন্যায় করলে সাথে সাথেই শাস্তির একটা প্রাকৃতিক বিধানও তিনি দিতে পারতেন। কিন্তু এমনটা কখনো হতে দেখিনা আমরা। শিক্ষক যেমন সিলেবাস দিয়ে পাঠ্য বই জানিয়ে দিয়ে বলে দেন- এই তোমার সিলেবাস,

www.pathagar.com

এই তোমার বই, যাও পড়ো। সব পড়লে দেখবে এখান থেকেই প্রশ্ন আসবে, উত্তর সঠিক হলে পুরস্কৃত হবে, বেঠিক হলে তিরস্কৃত হবে। তেমনি স্রষ্টাও সব জানিয়ে দিয়েছেন।

ভালো ছাত্ররা এসব বুঝতে পারে ও সে অনুযায়ী কাজ করে বলে ফলাফল ভাল করে আর খারাপ ছাত্ররা তাদের মনের খেয়ালে পড়ালেখা না করে দুষ্টুমি করার পরিণতিতে খারাপ ফলাফল করে এবং পরবর্তীতে ভোগান্তিতে পড়ে। এভাবে আমরাও আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কীভাবে ব্যবহার করবো তা শিশুদের জানিয়ে দিতে হবে। সুন্দর মানুষ হতে হলে জ্ঞান বিবেক ও ইচ্ছার স্বাধীনতার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। আমাদের মাথায় এ বিষয়টি পরিস্কারভাবে থাকা উচিত।

সুন্দর মনে সুন্দর হাসি
আমরা সবাই ভালবাসি

"Face is the index of mind" 'মুখ আমাদের মনের আয়না'। সুন্দর মানুষের থাকা চাই সুন্দর মন।

তোমার মুখের হাসি বলে দেবে তোমার মনটা কেমন।

প্রিয় নবী মুচকি হাসতেন। একটি সুন্দর মুচকি হাসি যে কোন মানুষের হৃদয়ে একটি গভীর স্থান করে নেয়। মন সুন্দর না হলে হাসি সুন্দর হতে পারে না। প্রতারকের সুন্দর হাসির মধ্যেই তার ছাপ থেকে যায়।

বিমানের ক্রুদের বলা হয়-গভীর কষ্টের মাঝে ও হাসতে হবে।হ্যাঁ, শিশুদের নিয়ে আমরা যারা কাজ করি তাদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা।

মুখ ব্যাদান করে থাকা লোককে কেউ ভালোবাসেনা। শিশুরা বিশেষ ভাবে এ ব্যাপারে স্পর্শকাতর। গোমরা মুখো, অতি রাশভারী লোকদের কাছে বাচ্চারা যেতে চায়না। এটি তার natural habit. মা বাবার শত বেদনার মাঝেও যখন ছোট্ট শিশুর কোমল হাসির ঝিলিক চোখে পড়ে তারা তখনই গভীর মমতায় তাকে বুকে তুলে নেন।

তাই আমাদের মনটাকে সুন্দর নিস্কলুষ, সরল ও মমতাময় করে তুলতে হবে।

সুন্দর মন মানেই হলো-দুঃখ কষ্টহীন মন। যে মন অন্যের মনকে সহজে বুঝতে পারে।

www.pathagar.com

সুন্দর কথা

মানুষকে বলা হয়- বাক শক্তি সম্পন্ন প্রাণী। অন্য কোন প্রাণীর এ ধরনের ভাষা বৈচিত্র নেই, নেই কথার যাদু, ভাব প্রকাশের উচ্চারিত ধ্বনিমালা। আল্লাহ চমৎকার করে বলেছেন- "দয়াময় আল্লাহ। তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন কোরআন। আর তাকে শিখিয়েছেন কথা। মানুষ কথা দিয়েই তার সমস্ত ভাব প্রকাশ করে। তার সমস্ত আনন্দ বেদনা, হাসি কান্না, ভালো লাগা মন্দ লাগা সে এই ভাষাতেই ফুটিয়ে তুলে। তাই কথা তার একটি বড় বাহন, বড় মাধ্যম। একটি সুন্দর কথা সহজেই একজনকে জিতে নিতে পারে, আবার একটি অসুন্দর বাক্যই চির দুশমনে পরিণত করতে পারে কাউকে।

এজন্য সুন্দর কথা বলার একটি প্রশিক্ষণ লাগে।

প্রশিক্ষণটি আমরা সর্ব প্রথম পাই আমাদের জন্মের পর ঘরে। যে শিশুটি এক বৎসরের মাথায় কথা বলতে শুরু করে সে শিশু জন্মের পর থেকেই বারবার এসব কথা মা বাবা ভাই বোনসহ ঘরের সব সদস্যের কাছ থেকে শুনতে থাকে। সে এগুলো ধীরে ধীরে রপ্ত করতে থাকে, সুপার কম্পিউটারের মেমোরীতে ধারণ করতে থাকে। এভাবে সে যেখানে থাকে সেখানকার লোকদের মত কথা বলতে শুরু করে। জন্মের পর আল্লাহর নবী মদীনার বনু সা'দের গোত্রের দুধ মা হালিমার ঘরে ছিলেন। আর বনু সা'দের লোকেরা সুন্দর ও শুদ্ধতম আরবী বলতেন। সে জন্য তিনি বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট কথা বলতে শিখেছিলেন। এ জন্য আমরা আমাদের শিশুদের মুখে সুন্দর কথা তুলে দিতে হলে সব সময় বিশুদ্ধ কথা বলতে হবে। আঞ্চলিকতা পরিহার করতে হবে, ভাষাকে প্রাঞ্জল ও রসালো করতে হবে। হৃদয় কেড়ে নেয়ার মতো করে কথা বলতে হবে।

ইতিবাচক, হ্যাঁ সূচক কথা বলতে হবে।

আজকের দিনের শ্লোগান হচ্ছে- শিশুদের জন্য হ্যাঁ বলুন।

একটি চমৎকার প্রবাদ রয়েছে- যে গাছটি হবে তার পাতা কালো

যে ছেলেটি হবে তার কথা ভালো।

এখানে 'হবে' মানে- বড় হবে, সুন্দর হবে, জিতবে।

এজন্য আমাদের নিজেদের কথা সুন্দর করার পাশাপাশি আমাদের শিশুদের কথাও সুন্দর করতে হবে। ওদের সাথে শুদ্ধ বলতে হবে, ইতিবাচক কথা

www.pathagar.com

বলতে হবে, আশা জাগাতে হবে, ভাষা ও ভাবকে সামনে রেখে দেহের ভাষা (body language) ঠিক করতে হবে।

ইংরেজীতে বলা হয় First impression lasts. প্রথমদিনের সুন্দর একটি সম্ভাষণ, কিংবা কথা দীর্ঘদিন অন্যের মনে জেগে থাকে। সুন্দর কথা বলা, শিখা হোক আমাদের একটি নিয়মিত অভ্যাস।

সুন্দর কাজ

'বাক পটু' মানুষেরা অনেকেই কাজে অপটু হন বলেই জন্ম নিয়েছে 'কাজে ঠনঠন' কথাটি। একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য একদল মিষ্টি ভাষী মানুষ যেমন দরকার, তারচেয়ে বেশী দরকার একদল কর্ম পাগল মানুষ।

এসব মানুষের জীবন হবে সব সুন্দর কাজের সমাহার। তার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কাজ এমন হবে যা দেখে 'বাবা মার চক্ষু শীতল' হয়ে যাবে আর পাড়া প্রতিবেশীদের মুখে মুখে থাকবে তাদের সুনাম ও সুখ্যাতির কথা।

তাদেরকে মানুষ ঈর্ষা করবে তাদের কাজের জন্য। সবাই চাইবে- ইস্ আমিও যদি এ লোকটির মতো হতে পারতাম। আমার ছেলেটি যদি ঐ ছেলেটির মতো হতো।

শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। যে শিশুরা আমার সাথে কাজ করবে তারা আমার মতোই কাজ করতে চাইবে। আমি কোন খারাপ কাজ করলে তারা মনে করবে এটাই মনে হয় ঠিক কাজ। এজন্য তাদের সামনে আমার জীবনকে role model বা আদর্শ স্থানীয় করতে হবে। আমার পদক্ষেপের দিকেও শিশুর চোখ থাকে, চোখ থাকে কথাবার্তার দিকে, মানুষের সাথে আমার সকল আচার ব্যবহারের দিকে, এমনকি আমার বদ অভ্যাস গুলোও তাকে সংক্রমিত করতে পারে। একবার দেখা গেলো একজন ভাইয়ের নাঁকি কথাকে অনুকরণ করছে একটি শিশু। মনের অজান্তে শিশুটি নাকি কথা বলাটাকেও একটি style মনে করে পছন্দ করে নিয়েছে। অন্য শিশুদের সামনে সুন্দর কাজের পসরা সাজিয়ে দিতে হবে যাতে তারা সেখান থেকে সব সুন্দর আকর্ষণীয় বিষয়গুলোকে নিয়ে নিজেদের জীবন সাজাতে পারে।

সুন্দর কাজ কী?

সহজ করে বলতে হয় যে কাজ অন্যকে টানে। যে কাজ সুরভি ছড়ায়। যে কাজ বিমোহিত করে। হেসে কথা বলা, শান্ত ও ধীর হয়ে চলা, পথের কাঁটা

www.pathagar.com

সরানো, অন্ধকে রাস্তা পার করে দেয়া, বৃদ্ধকে বসতে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে যাওয়া, ছোটদের আদর করা, বড়দের শ্রদ্ধা করা, বাবা মার কথা শোনা - এসবই সুন্দর কাজ।

সুন্দর কাজ সুন্দর মনেরই প্রকাশ ঘটায়।

সুন্দর সাজ

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে- *আগেতো দর্শনধারী, তারপর গুণ বিচারী।*

বিশেষ করে শিশুরা দর্শন প্রিয়। দেখে ভাল না লাগলে ওরা কাছে ভিড়ে না। এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতিও আমাদের তাই শেখায়।

আল্লাহর ইচ্ছাতেই আমরা দেহের গড়ন, চুলের ধরণ, মুখের শ্রী ইত্যাদি পেয়ে থাকি। গায়ের রংটাও তারই দেয়া। এরপরও আমরা এসবের বিবেচনা করে থাকি। কিন্তু, শরীর পাক সাফ রাখা, চুল কেটে ছেঁটে সুন্দর করা, দাঁত ব্রাশ করে পরিষ্কার রাখা, হাত পায়ের নখগুলো নিয়মিত কাটা, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোষাক আশাক পরা এসব আমাদের ইচ্ছার উপর।

একজন সুবেশিত মানুষ একজন সুবাসিত মানুষ। শিশুরা সুন্দর, আকর্ষনীয় পোষাক-আশাক পছন্দ করে। কাউকে পছন্দ হলে তার মতই কাপড়-চোপড় পরতে অভ্যস্থ হয়। Style এর নামে কোন বাড়াবাড়ি অনেক সময় আমাদের ইমেজ নষ্ট করে। বুঝতে হবে কোথায় কী ধরনের সাজ-সজ্জা হওয়া উচিত। তা না হলে লজ্জায় পড়তে হতে পারে। সুন্দর জীবনের জন্য বারবার লজ্জিত হওয়া সুখবর নয়।

আরেকটি কথা পোষাকের বাহারের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ হলো তার পরিচ্ছন্নতা। সবসময় ধোয়া, ইস্ত্রি করা নিভাজ কাপড় পরা অন্যকে আগ্রহী করে তোলে। সম্ভব হলে সুগন্ধি (Scent) ব্যবহার করা উচিত। আতরও হতে পারে। সুন্দর সাজ আমাদের অনেক কাজকেই সহজ করে দিতে পারে। কখনও কখনও আমাদেরকে আনুষ্ঠানিকতার স্বার্থে বিশেষ ও আনুষ্ঠানিক পোষাকে সাজতে হয়। যেমনঃ কোন সাংগঠনিক কর্মসূচীতে সংগঠনের সদস্য ও নেতৃবৃন্দকে সেই পরিচিত সংগঠনের পোষাকেই মানায় ভাল। ঈদের মাঠে পাজামা পাঞ্জাবী, খেলার মাঠে ট্র্যাক স্যুট, সেমিনার সভায় কেতা-দুরস্ত পোষাক এভাবে যেখানে যা মানায় সেভাবেই পোষাক পছন্দ করা উচিত।

www.pathagar.com

মমতার বন্ধন

ভালবাসা, মায়া, মমতা, আদর-যত্ন, স্নেহ এসব শব্দ আমাদের অতি প্রিয়, প্রাত্যহিক শব্দমালার অংশ। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি জগতকে যেমন সীমাহীন ভালবাসায় ধন্য করেছেন তেমনি তিনি সবার মাঝেই এই সুন্দর গুনটি ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই ভালবাসার বিনি সুতার মালাই বেঁধে রেখেছে সবাইকে।

প্রতিটি মানুষই ভালবাসার কাঙ্গাল, স্নেহ কাতর ও মমতার সন্ধানী।

সুন্দর মানুষ ও সুন্দর সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে আমরা যারা কাজ করবো তাদের একমাত্র পুঁজি এই ভালবাসা। ধন নয়, জন নয়, মমতাই আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আর মন যদি পেতে হয় তাহলে পাত্র ভেদে মমতা ও ভালবাসার সম্পর্ককে গাঢ় করতে হবে।

আল্লার নবী বলেছেন- যারা বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করে না, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রিয় নবী শৈশব থেকেই বড়দের যথাযথ সম্মান করতেন, এমনকি বড় হয়েও কখনও তা ভুলে যাননি। একবার তাঁর কাছে এলেন ধাইমা হালিমা। নবী সবার মাঝ থেকে উঠে গিয়ে তাঁকে সম্মান করলেন আর তার বসার জন্য বিছিয়ে দিলেন নিজের গায়ের চাদরখানি। ছোটদের আদর করার ক্ষেত্রে তার তুলনা তিনিই। নানা হিসেবে রাসূল তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইনকে কত আদর করতেন তা সহজেই বুঝা যায়। নামাজের মাঝে শিশু হাসান বা হুসাইন তাঁর সামনে এসে গেলে তিনি তাঁদেরকে আস্তে করে সরিয়ে দিতেন। কিংবা সরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। নিজে ঘোড়া সেজে তাদেরকে পিঠে চড়াতেন।

এসব ঘটনা আমাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কতটুকু দয়ার সাগর হতে হবে আমাদের। কত মমতায় জড়িয়ে নিতে হবে সবাইকে। আমাদের ঘর থেকেই এর যাত্রা। নিজের সন্তান, ভাই-বোনকে আদর করতে হবে সব চেয়ে গভীরভাবে। ওরা যেনো আমাদের ভালবাসা, মায়া ও মমতার তাপ বুঝতে পারে। আমাদের কন্ঠ শুনলেই যেনো ওরা ছুটে আসতে চায়। দৌড়ে যেনো বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

অবশ্য মমতা ভাষায় বুঝানোর বিষয় নয়, জড়িয়ে নেয়ার বিষয়টিই প্রধান। মমতার মায়ায় জড়িয়ে নিতে হবে সবাইকে। তাই বলে একচোখা হওয়া যাবে না। যতদূর সম্ভব প্রতিটি মানুষকে, প্রতিটি শিশুকে সমান চোখে

www.pathagar.com

দেখতে হবে। ওরা যেনো প্রত্যেকেই বুঝতে পারে তাকেই আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি, আদর করি।

সংগঠকগন মমতার বন্ধনে বেঁধে নেন ঘরের নানা বয়সের মানুষদের। বিশেষ করে শিশুরা তাদের আপন ভাই-বোনের মতোই আপন করে পেয়ে যায় তাদের। এমনও হতে দেখেছি তাদের অসুস্থ অবস্থায় তার প্রিয় সংগঠককে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায় শিশু কিশোরের মন। একটু খানি আদর, একটু খানি ছোঁয়া-তাকে সুস্থ, হাসি খুশি করে তোলে।
এভাবেই আমরা এক বাগানের চাষ করছি। এ বাগানের প্রতিটি ফুলই হবে সুবাসিত, সুরভিত ও সর্বোত সুন্দর।

সুন্দরের সন্ধানে আমাদের এই অভিযাত্রা থামবেনা কখনো,
কখনো থমকে যাবোনা আমরা ফুলের কেয়ারী সাজাতে,
মমতার এই বন্ধন টুটবেনা কখনো।

www.pathagar.com

বিজয় দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য

১৬ই ডিসেম্বর, বিজয় দিবস, নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে পাকিস্তানী সেনা শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের বিজয়ের দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলার আকাশে পত্ পত্ করে উড়তে থাকে বিজয়ের পতাকা। ঘরে ঘরে নেমে আসে মুক্তি ও আনন্দের উল্লাস। সেই থেকে প্রতি বছরই ঘুরে ঘুরে আসে দিনটি, সর্বত্র আলোচিত হয় এই দিবসটির তাৎপর্য আর প্রতিবারই প্রায়শ: উচ্চারিত হয় হতাশার বাণী- আজো আমরা বিজয় দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য খুঁজে পাইনি, এখনো তা নিশ্চিত হয়নি।

বছরের পর বছর এই একই হতাশার বাণী শুনতে শুনতে আমরা ক্লান্ত। এই ক্লান্তিকর, আত্মবিধ্বংসী, অন্যায্য বিষয়টি থেকে আমাদের জাতির মুক্তি অপরিহার্য।

কীসের বিজয়, কার বিজয়?

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ লক্ষ ভাই-বোন জীবন বিলিয়েছেন। এই হিসেবটি যদিও নানাভাবে সমালোচিত, এর যদিও কোন প্রকৃত সংখ্যা নিরূপিত নয় তবুও এটিই সর্বজনবিদিত ও গৃহীত সংখ্যা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত। ভারতের সহযোগিতাটি ছিল রাষ্ট্রিক, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির পক্ষ থেকে নয়। যার ফলে মাত্র ন'মাসের যুদ্ধেই পাক সেনারা কুপোকাত হয়ে যায়, কেবল বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে এককভাবে এ অর্জন এত দ্রুত করা সম্ভব হতো না। বিজয় হয়েছে বাংলাদেশের, এদেশের মানুষের, মুক্তিযুদ্ধের কিন্তু পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পন করেছে ভারতীয় বাহিনীর কাছে। আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা হয়েছে ভারতীয় জেনারেল অরোরা আর পাকিস্তানী জেনারেল নিয়াজীর মাঝে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম.এ.জি ওসমানীকে সেখানে ডাকা হয়নি, তার অনুপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়। এ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সকল বই ও রচনায় আত্মসমর্পন কাহিনীর বিষয়টি আনা হয়েছে। কিন্তু কেউ-ই সেই প্রশ্নটির জবাব দিতে পারেননি কেন সেদিন এম.এ.জি ওসমানীকে

www.pathagar.com

আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি? তিনি কী অভিমান করে আসেননি, নাকি তাকে অনুষ্ঠানে আসতে দেয়া হয়নি? আমরা বিজয়ী হয়েছি, স্বাধীনতা অর্জন করেছি, স্বাধীনতাত্তোর তিনযুগের অধিক সময়কাল অতিক্রম করেছি। এরপরও আমাদের কোথায় যেন বিরাট ঘাটতি, দুঃখ, ক্ষোভ, কষ্ট, অন্ত র্জ্বালা, আত্মশ্লাঘা ও পরাজয় রয়ে গেছে। সে পরাজয় বিজয়ের সমস্ত আনন্দকে মাটি করে দিচ্ছে, ম্লান করে দিচ্ছে।

বেশী দামে কেনা, কমদামে বেচা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ী হওয়ার পর চারটি বছর যেতে না যেতেই দেশের প্রবীণ রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী আবুল মনছুর আহমদ বই লিখতে বাধ্য হন। যার শিরোনাম ছিল-বেশী দামে কেনা, কম দামে বেচা, আমাদের স্বাধীনতা।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর এম.এ জলিল লিখেন- 'অরক্ষিত স্বাধীনতাই, পরাধীনতা।' মুক্তিযোদ্ধা কবির সাহসী উচ্চারণ- 'ভাত দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র খাবো।' একজন মুক্তিযোদ্ধা ছড়াকার লিখতে বাধ্য হন- 'ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না, বলা যাবেনা কথা/রক্ত দিয়ে পেলাম শালার এমন স্বাধীনতা।'

অর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে আমরা নানা রকম সংগ্রাম, সংঘাত ও অসামঞ্জস্যতার শিকার। ৩০ কোটি হাতকে আমরা হাতিয়ারে পরিণত করতে পারিনি। মানব সন্তানদের সম্পদে রূপান্তরে ব্যর্থ হচ্ছি বলেই জনসংখ্যা আমাদের জন্য বোঝা। ১৯৬৭ সালে যারা মাথাপিছু আয়ে আমাদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলো আমাদের পরে স্বাধীন হয়েও তারা আজ অর্থনৈতিক ব্যঘ্র আর আমরা তলাহীন ঝুড়ির বদনাম ঘুচানোতে প্রানান্ত। শিক্ষার হার আনুপাতিক হারে বেড়েছে কিন্তু তার কোন সুস্থ প্রতিফলন সামাজিক জীবনে নেই। মুর্খতা, অজ্ঞতা, পশ্চাৎপদতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনাস্থা আমাদের পা'কে অদৃশ্য থেকে টেনে ধরছে। মানুষ চলছে সামনে আমরা চলছি পিছনে। মানুষ পা রাখে মঙ্গলে আর চাঁদে, আমাদের পা বারবার ফসকে চলে যায় ফাঁদে। আমাদের রাজনীতিকরা আন্তঃ ও অন্ত কলহে ব্যস্ত, উন্নত বিশ্বের রাজনীতি দেশ ও জাতির চাকাকে সামনে চালানোতে অভ্যস্ত। আমাদের রাজনীতির কালচার কী? এ প্রশ্নের কোন সুস্পষ্ট জবাব নেই। ক্ষমতায় থাকা ও না থাকার সাথে ওতপ্রোতভাবে বদলে যায় এ কালচারের মানদন্ড। সাংস্কৃতিক কোন

www.pathagar.com

মূল্যবোধ বা নিরিখ এখনও ঠিক হয়নি। স্রোতের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে নিজস্বতা, স্বকীয়তা, আদর্শ ও মূল্যবোধ। আমাদের আকাশ অন্যের দখলে, আমাদের বাজার অন্যের বস্তুগত ও চিন্তাগত পন্যে সয়লাব। আমাদের ভূগোল পাল্টাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আমাদের আঙ্গিনায় ঘুঘু চড়ানোতে আয়েশ বোধ করেন চতুর প্রতিবেশী। আন্তর্জাতিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করেই আমাদের মেরুদন্ডহীন শাসকগোষ্ঠির নাকে রশি দিয়ে ঘুরাচ্ছে সে।

প্রকৃত অর্থে, সর্ববিচারে আমরা ঠিক বিজয়ী নই, স্বাধীন হয়েও পরাধীন, যেমনটা হয় বৃহৎ পরিবারের অনৈক্য পীড়িত, সমঝোতা বঞ্চিত অনেকগুলো ভাইয়ের ক্ষেত্রে, যাদেরকে কাবু করে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ দুর্বল প্রতিবেশী পরিবারের সদস্যগন।

একবার যদি ভেবে দেখি

☐ ১৯৭১ সালে দেশ বিজয় লাভ করলে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তখন জনপ্রিয় যে কোন বিশ্বনেতার চেয়ে এগিয়ে। তাকে বলা হলো বাংলার দ্যাগল। তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৭ই জানুয়ারী, '৭২। তিনি তাড়াহুড়া করে না করে কিছুদিন পরে ফিরলে ভাল করতেন। গিয়েছিলেন জার্মানী। সেখান থেকে কিছুদিন ভাবনা-চিন্তা করে জাতির উপযোগী কিছু কর্মসূচী নিয়ে এলে ভাল করতেন।

তিনি যদি একবার ভেবে আসতেন- কী করে যুদ্ধ বিধ্বস্ত, ভঙ্গুর অর্থনীতিতে আক্রান্ত জার্মানী আবার জি-৮ এর সদস্য হলো। জাপান কী করে কোন কাঁচামাল ছাড়াই কেবল মানব সম্পদ গড়ে তুলে এগিয়ে এলো। তিনি যদি ভাবতেন আর আপ্তবাক্য, জ্বালাময়ী ভাষণ নয় এবার কী করে সুশাসন ও সুন্দর দেশ গড়া যায়- তাহলেই হয়ত বিষয়টি হতে পারতো অন্য রকম।

☐ যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশ, ভঙ্গুর অর্থনীতি সম্পন্ন একটি রাষ্ট্র- কেবল ঐক্য ও সংহতির মাধ্যমেই শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা বিগত বছরগুলোতে ক্ষমতার পালাবদল ও হাতবদল দেখছি, দেখছিনা কেবল মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন। এটা কেন হলো? ইংরেজ আমাদের শাসন করেছে এই ডিভাইড এন্ড রুল দিয়ে, পাকিস্তানীরাও এর ব্যতিক্রম করেনি। বিগত পাঁচ পাঁচটি সরকারও সেই একই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। ফলে জাতীয় ঐক্য

www.pathagar.com

গড়ে ওঠেনি। বিজয়ের ক্রেডিট দখলের অসুস্থ লড়াই হয়েছে। বিজয়কে ধরে রাখা ও সুসংহত করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয় নি।

❑ এ ধরণের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র-সরকার সব সময় গুরুত্ব দেয় মানব সম্পদ সৃষ্টি ও বৃদ্ধির দিকে। যা করেছে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডসহ আমাদেরই সমপর্যায়ের দেশগুলো। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য এর নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে অজ্ঞতা এবং অন্যমনস্কতার কারণে কখনও বিষয়টি নিয়ে ভাবেনি। তারা ভেবেছেন নিজকে নিয়ে, নিজের পরিবার, দল ও গোষ্ঠিকে নিয়ে। তারা দেশ ও দশের ভাগ্য নিয়ে ভাববার অবকাশ পাননি, প্রয়াস পেয়েছেন নিজেদের ভাগ্য বদলের।

শেখ মুজিব বারবার আফসোস করেছেন- "মানুষ পায় সোনার খনি, আমি পাই চোরের খনি।" তিনি সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছেন, কিন্তু সে চাওয়াকে বাস্তবায়নের জন্য যে সোনার মানুষ দরকার তা গড়ার কোন বাস্তব কর্মসূচী হাতে নেননি। এ বিষয়টি পরবর্তী সরকারগুলোও আমলে আনেননি। ফলে আমরা এক তিমির থেকে অন্য তিমিরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি।

❑ আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি, গণতন্ত্র, পরমত সহিষ্ণুতাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদানে ব্যর্থ হয়েছি কিন্তু দুর্নীতিকে পুলিশ প্রশাসন সহ সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর সর্বত্র প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছি। হায়রে অভাগা দেশ! হ্যাট্রিক করার মতো আর কোন ইভেন্ট আমাদের ভাগ্যে এলোনা, আমরা কিনা করলাম দুর্নীতিতে হ্যাট্রিক। এরপরও আশাহত হওয়ার কিছু নেই। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সততা বিচারে আমরা ভারত থেকে কিছুটা হলেও এগিয়ে আছি।

❑ **আমাদের অর্জন একেবারে কম নয়।**

প্রথমত: আমরা এখন গণতন্ত্রের পথে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছি। পরপর চারটি নির্বাচিত সরকার পেয়েছি। সরকার সমূহ বিরোধিতার মুখেও এ পর্যন্ত প্রায় পূর্ণ-সময়কালীন দেশ চালিয়েছেন। স্বৈরাচার ও সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথর তিরোহিত। আবার জেঁকে বসার তেমন রাস্তা খোলা নেই।

দ্বিতীয়ত: দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে বেশ। মানুষের জীবনে গতি এসেছে। পথের দূরত্ব কমে গেছে। প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে সর্বত্র। অনেকে বলেন অবকাঠামো হয়েছে কাঠামো হয়নি। এটা মেনে নিয়েও বলব

www.pathagar.com

একটাতো হলো। ওয়ান স্টেপ এহেড। নেতিবাচকতা আমাদের বড় ব্যাধি। এ ব্যাধি পরিহার করা দরকার।

তৃতীয়ত: শিক্ষার হার বেড়েছে। বেড়েছে স্বাস্থ্য সচেতনতা। শিশু মৃত্যুর হার, প্রসূতি মৃত্যুর হার সম্মানজনকহারে কমেছে। অপমৃত্যু আছে, সেটি কোথায় নেই? তবে তা কমিয়ে আনা খুবই সহজ। এসবই উন্নয়নের প্যারামিটার।

চতুর্থত: আমাদের সামাজিক বন্ধন, পরিবার প্রথা ভাঙ্গার হাজারো অপপ্রয়াসের পরও আমরা পারিবারিক সুখ ও সমৃদ্ধিতে অগ্রসর। পরিবার যারা ভাঙ্গতে চায়, এ কাঠামো যারা গুঁড়িয়ে দিতে চায় আমাদের সমাজ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে এবং করছে।

পঞ্চমত: টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে বারবার। তারপরও অর্থনীতিতে অভ্যন্ত রীন উৎস থেকে আয় বাড়ছে। আমরা ধীরে সুস্থে স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর হওয়ার পথে। আমাদের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য।

ষষ্ঠত: স্বাধীন দুর্নীতি কমিশন, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, ন্যায়পাল- এসব আমাদের অগ্রগতির ধাপ।

☐ উল্লেখযোগ্য সব অর্জনের পরও আমরা পিছিয়ে। বিজয় দিবসের তাৎপর্য উপলব্ধি করেও আমরা তা সমুন্নত করতে পারছিনা। এজন্য প্রয়োজন সিদ্ধান্তের। প্রয়োজন সদিচ্ছা ও সৎ সাহসের। ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ বলার সাহসটাই আমাদের নেই। আমাদের কাছে অন্যের সবই মন্দ, নিজের সব ভাল। এ কোন সুস্থতার লক্ষণ নয়। আমার লোক ধরা পড়লে ছেড়ে দাও, আর অন্যের লোককে বেঁধে এনে মারো ধরনের প্রবণতা প্রবল। এ দুষ্টক্ষত থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা এখনো আমাদের চিত্ত ভয় শূন্য হয়নি। শির উঁচিয়ে রাখার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি আমরা। যেদিন এ বিজয়টি অর্জিত হবে, সেদিন হয়তো বিজয় দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি ও বাস্ত বে দেখতে পাবো।

www.pathagar.com

স্বপ্নের ঠিকানা

এক,

বাংলাদেশ।

সবুজে শ্যামলে ঘেরা এই দেশ। এইতো আমার দেশ।

এ আমার দেশ। আমার পিতা, পিতামহের দেশ। অনাগতদিনের উত্তর প্রজন্মের দেশ। হাজার খুশির এই দেশ। লক্ষ বেদনার এই দেশ। আশা-নিরাশা, হতাশা ও প্রত্যাশার এই দেশ। এই দেশ আমার প্রেরণার দেশ, চেতনার দেশ। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, তৃপ্তি-অতৃপ্তির দেশ।

বাংলাদেশ।

স্বপ্ন-দু:স্বপ্নের পাশাপাশি যাত্রা, তবুও হাজার-লক্ষ স্বপ্নের এই দেশ। এখানে আমার পূর্বপুরুষের অনেক রঙ্গিন স্বপ্ন বাস্তবে রুপ নিয়েছে, আবার কত স্বপ্নইতো রয়ে গেছে অবাস্তবায়িত। এখানেই আমার স্বপ্নেরা মেলেছে ডানা। এখনও জানা-অজানা অনেক স্বপ্নের ভিড়ে আমরা বেঁচে আছি। বারবার হোঁচট খাই তারপরও আমরা মঙ্গলের, কল্যাণের, শুভের স্বপ্ন দেখি। আর স্বপ্ন দেখাই আগামী প্রজন্মকে। এই অসংখ্য নাই ও নেই এর রাজ্যে এক আকাশ স্বপ্ন দিয়ে আমরা গড়ে তুলি আমাদের ভবিষ্যত। স্বপ্ন আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি, স্বপ্ন আছে বলেই মানুষের উদ্যম বেঁচে আছে। শুধু স্বপ্নের আবেশেই আমরা ভালবেসে যাচ্ছি একটি দেশকে।

বাংলাদেশ।

আমাদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার দেশ। একদিন এরই জন্য দামাল-কিশোর ঘরের বাঁধন ছিন্ন করে শাবল-গাঁইতি হাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। একদিন এরই জন্য মা তাঁর সন্তানের বুকে চুমোর আলতো রেখা এঁকে চির বিদায় জানিয়ে আল্লার দরগায় সেজদায় অবনত হয়েছিলেন। এরই জন্য রাতের আঁধারে গ্রামছাড়া কাফেলায় শরিক ভয়ার্ত মানুষের

www.pathagar.com

মিছিলে মা তার চার মাসের শিশুটিকে কাঁধে নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছেন। এরই জন্য হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে অসহায় গ্রাম্য মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল হায়েনার সশস্ত্র আক্রমণ।

বাংলাদেশ। একটি লাল সূর্য, পূবের আকাশে প্রদীপ্ত ভাস্বর। এই সূর্যটিকে ছিনিয়ে আনার স্বপ্ন দেখেছেন আমাদের পূর্বসূরীরা। এই সূর্যের আলোতে বেড়ে উঠেছে আমাদের স্বপ্নগুলো। রক্তলাল সূর্যের মাঝে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যত রঙ্গিন স্বপ্নেরা। বন্য স্বপ্নেরা।

বাংলাদেশ।

আমার দেশ, আমার ভালবাসা। আমার স্বপ্ন, আমার আশা। আমাদের অদ্ভুত প্রাণের স্পন্দন এই দেশ। আমাদের হাজারো স্বপ্নের ঠিকানা এই দেশ।

দুই. যে অতীত তোমার আমার

আমি আমার অতীতের কথা বলচি। "আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি- যার পিঠে রক্ত জবার মত ক্ষত ছিল।" ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে এই বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গিয়েছিল। ২৩ শে জুন মীর জাফর, ঘষেটি বেগম আর জগৎশেঠদের চক্রান্তে আমাদের পূর্বপুরুষেরা হাতে শেকল পরেছিল। পরাধীনতার শেকল। গোলামীর শেকল। এই শেকল ছেঁড়ার গান গেয়েছিল বালাকোটের শহীদেরা। ১৮৫৭ সালে আবার আমার পূর্ব পুরুষের সিপাহীরা বিপ্লবে মেতে উঠেছিল। কিন্তু ওরা পারেনি। ইংরেজের দুর্ধর্ষ শাসনের কাছে ওরা হেরে গেছে। তবুও ওরা কালজয়ী। ওরাই স্বপ্নহীনতার মাঝে স্বপ্নের জন্ম দিয়েছে। বিদ্রোহের স্বপ্নে বিভোর করেছে। বিদ্রোহে মেতেছিল তিতুমির, গড়েছিল বাঁশের কেল্লা। ওদের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েই আমাদের কবির কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে।---- 'কারারই লৌহ কপাট, ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী।'

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে এই পাষাণ কারার অভ্যন্তর থেকে মুক্তির লালসূর্য ছিনিয়ে এনেছে আমার পূর্বপুরুষ। আমরা স্বাধীন হয়েছি। ইংরেজ বিদায় নিয়েছে। কিন্তু বিদায় নেয়নি তাদের প্রেতাত্মা। আবার শাসন। আবার শোষণ। আবার বঞ্চনা। আবার গঞ্জনা। স্বপ্নের ফানুস হঠাৎই যেন চুপ্‌সে গেলো। পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান বড় হয়ে দেখা দিলো। হাজার মাইলের ব্যবধানকে জুড়ে দিয়েছিলো যে স্বপ্ন- ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধাবোধ উর্ধ্বে তুলে ধরার স্বপ্ন - সে স্বপ্নরা হয়ে গেল উপদ্রুত। আমাদের উপদ্রুত স্বপ্নরা আমাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ালো।

আবার ডাক এলো- "যার যা আছে তা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ো।" আমাদের পূর্বপুরুষেরা জেগে উঠলো। আবার তারা স্বপ্নাবিষ্ট হলো। স্বপ্ন ও সাহসের সম্মিলন ঘটিয়ে তারা এবার নতুন এক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এই তাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। তারা শুনলো- "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তারপর ২৫শে মার্চের কালো রাত্রি। মৃত্যু উপত্যকায় দাঁড়িয়ে শুরু হলো নতুন যুদ্ধ।

আমার পিতামহ জায়নামাজে বসে হাত তুললো - 'প্রভু, আমাদেরকে এই জালেম অধ্যুষিত জনপদ থেকে মুক্তি দাও।' তার উত্তোলিত হাতের পাশে আমার পিতার মুষ্টি বদ্ধ হাত ছিল। তাঁর চোখে অশ্রু ছলছল করছিল। তার মনে অসংখ্য স্বপ্নরা কলকলিয়ে উঠেছিল। তার বুকের গহীনে এক আকাশ সুখের পায়রা ডানা মেলেছিল। তিনি শপথ নিয়েছিলেন- "মুক্ত করবো আমার স্বদেশ প্রিয় মানুষের জন্য।" আমাকে স্বপ্নে দেখে তিনি আমার জন্য একটি স্বাধীন আকাশ নির্মানের কথা ভেবেছিলেন। আমার মা সদ্য পরীণিতা এক সরল গাঁয়ের বধু। তার স্বামীর সাথে তিনিও হাত তুলেছিলেন। আবেগে কম্পমান তার মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে এসেছে "আমীন।" এভাবেই আমার পিতামহ, পিতা, জন্মদায়ীনি মা আর আমার স্বপ্নরা এক সরলরেখায় মিলিত হলো। আমরা সবাই মিলে রচনা করলাম মুক্তির মোহনা। লড়াইয়ের নতুন সড়ক।

www.pathagar.com

তারপর সেই লড়াই চললো ৯টি মাস। টানা নয় মাসের সেই লড়াইর কথা কে না জানে? হ্যাঁ, অনেকেই জানে না। যারা জানে তারাইবা কতটুকু জানে? ইতিহাসের কতটুকুইবা আমাদের জানানোর ব্যবস্থা হয়েছে? ইতিহাসের নামে বিকৃতি চলছে সমানে। কোন সঠিক ইতিহাসতো আমরা আজো পাইনি।

তিন. মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা ও পিতার স্বপ্নভঙ্গ

শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। ঘরে বাইরে মুক্তিযুদ্ধ। স্বপ্নের মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধের দামামা বাজালেন যিনি তিনি বন্দী হলেন পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন কিংবা কারাবন্দী হলেন। সারাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। শহর-বন্দর-গ্রাম কোনটাই বাদ পড়লোনা। মুক্তিযোদ্ধারা জীবনপন লড়াই করতে লাগলেন। দেশের এককোটি মানুষ গৃহছাড়া হলেন। আশ্রয় নিলেন পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের শিবিরে। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ ও রসদ নিয়ে নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়ে দ্বিগুন উৎসাহে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তারা।

যুদ্ধ হলো। ১১টি সেক্টরে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম.এ.জি. ওসমানীর নেতৃত্বে "আমি মেজর জিয়া বলছি" বলে যে ডাক দিয়েছিলেন এক তরুন মেজর সেই ডাকে সাড়া দিলেন দেশের মানুষ। যুদ্ধের ভয়াবহতার মাঝেও মুক্তিযোদ্ধার চোখে ভাসতো এক শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন। তারা দেখতো- এইতো আর কটাদিন। তারপরইতো আমরা লাল-সবুজের পতাকা খচিত এক স্বাধীন দেশের নাগরিক হবো। আমার পিতা এমনই এক স্বপ্ন দেখতে দেখতে অসমবীরত্বের সাথে লড়াই করতে লাগলেন। এক যুদ্ধে ভীষণ লড়ছিলেন তিনি। হঠাৎ দেখতে পেলেন তিনি শত্রুর গোলার আওতায় এসে গেছেন। জীবনের হয়তো এটিই শেষ মুহূর্ত। স্বপ্নের ভেতর হারিয়ে গেলেন তিনি। "আমার মা এক হায়েনার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পালাচ্ছেন। তার কাঁধে আমি আর পেটে আমার

www.pathagar.com

সহোদরা। ক্লান্তি ও অবসাদকে দুপায়ে ঠেলে গ্রামের সরল মহিলাটি হাঁটুজল ভেঙ্গে ছুটছেন আর বলছেন স্বপ্নের কথা- এইতো বাবা, আরেকটু, আরেকটু পরেই তোর বাবার কাছে যাবো। তোর বাবা যুদ্ধ থেকে ফিরে তোকে আদর করবে, বড় করে তুলবে।" স্বপ্নের ভেতরেই বাবার হাত চলে গেল হাঁটুতে। রক্তের এক উষ্ণ স্রোতে হাত দিয়ে তিনি বের করে আনলেন বিচ্ছিন্ন হাঁটু ও পা। আর কিছুই বুঝতে পারলেন না।

হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা শেষে আমার বাবা যেদিন ঘরে ফিরলেন সেদিন ছিল শুক্রবার। ষোলই ডিসেম্বর। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। দেশটা স্বাধীন হয়েছে। বাবাতো আর নিজে চলতে পারেন না। একটি ক্র্যাচে ভর দিয়ে তিনি দাওয়ায় দাঁড়ালেন। সেখান দিয়ে একদল মুক্তিযোদ্ধা মার্চ করে যাচ্ছে। লেফট রাইট লেফট। আমার বাবার উজ্জ্বল চোখগুলো অনুসন্ধানী টর্চের মতো জ্বলে উঠলো। সহযোদ্ধাদের মিছিল তাঁকে আনন্দিত করলো। আবারো তিনি স্বপ্নাতুর হলেন।

যুদ্ধ শেষ। এবার দেশ স্বাধীন, এবার সুখের সুদিন। মিছিলের অনেক পরিচিত মুখের ভিড়ে বেশ কিছু মুখ তিনি দেখলেন। এই মুখগুলো মুক্তিযুদ্ধের কঠিন দিনে অন্য কোথাও দেখেছিলেন। বেশ নাদুস নুদুস কিছু লোককে নয় মাসই কলিকাতায় থাকতে দেখেছেন। বিলাসবহুল হোটেলে মদ, মেয়ে আর নেশার স্বপ্নে এরা বিভোর ছিল। তার স্বপ্নের সাথে এদের স্বপ্নের কোন মিল ছিল না। এরাও এই মিছিলে আছে। আমার বাবা নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

মুক্তিযুদ্ধের একটি সার্টিফিকেট আর এক বুক আশা নিয়ে আমার বাবার নতুন দিনের শুরু। আমার মা ছায়ার মতো আমার বাবাকে আশ্রয় দিচ্ছেন। আমরা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি। আমার একটা নবজাতিকা বোন সাথে জুটেছে। আমাদের স্বপ্নগুলো রঙ্গিন হতে থাকলো। মুক্তিযোদ্ধা-পরিবার

www.pathagar.com

হিসেবে হয়তো আমরা অনেক কিছুই পাবো। শুনেছি বিদেশে মুক্তিযোদ্ধারা, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার দেশ ও জাতির কাছ থেকে অনেক কিছুই পায়।

দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন

রঙ্গিন স্বপ্নরা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসতে থাকে। ১০ই জানুয়ারী ১৯৭২। দেশে ফিরে আসেন আমাদের স্বপ্ন- দেখিয়েছেন যে যাদুকর তিনি। জানিয়ে দিলেন- "তিনবছর আমি কিছুই দিতে পারমু না।" তার কাছে আমরা কিছুই চাইব না- এটাই ছিল আমার বাবা মার প্রতিজ্ঞা। তিনি সরকার গঠন করলেন। সরকারের প্রতি বিদেশের স্বীকৃতি আসতে লাগলো। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ হিসেবে বিভিন্ন দেশ থেকে আসতে লাগলো রিলিফ সাহায্য। এরই মাত্র একবছর আগে বন্যায় বিরাট ক্ষতি হয়েছিল আমাদের। সুতরাং- সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলো। স্রোতের মত রিলিফ এলো কিন্তু সাধারণ মানুষ রিলিফ পেলো না। রাতের আঁধারে বাংলাদেশ থেকে সব দামী জিনিসপত্র চলে যেতে লাগলো সীমান্তের ওপারে ভারতে। বাংলাদেশটা যেনো এক হরিলুটের মাঠ। লুটে পুটে খেতে লাগলো একদল মানুষ সমস্ত দেশটাকে। রিলিফ চোরদের হাতে চলে যেতে লাগলো সাধারণ মানুষের রিজিকের অংশ। ওরা ফুলে ফেঁপে তথাকথিত বড়লোক হতে লাগলো। আর সাধারণ মানুষেরা হতে লাগলো দিন দিন নিঃস্ব। মাত্র দুই বছরের মাথায় দেশের চেহারা পাল্টে যেতে লাগলো।

আগে ছিল ২২ পরিবার। সহসাই দেখা দিলো ২২০ পরিবার। এরাই সমস্ত দেশটাকে ভাগ করে নিল। সরকার প্রধানের খেয়াল হলো দেশটিকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার কিন্তু সোনার বাংলা গড়বেন কি দিয়ে? সোনার মানুষ গড়ার কোন আয়োজনইতো তিনি করেননি। ফলে চারদিকে অভাবের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগলো চোর, ডাকাত, হাইজ্যাকার, লুটেরা ও সন্ত্রাসীর দল। এত রিলিফ যায় কোথায়? বিদেশীরা বাংলাদেশকে বলতে লাগলো তলাহীন ঝুড়ি, bottomless basket। নেতা নিজেই চিৎকার

www.pathagar.com

দিয়ে বলতে লাগলেন- "সবাই পায় সোনার খনি, আর আমি পাইছি চোরের খনি। আমার চারিদিকে চাটার দল। সাতকোটি মানুষের জন্য সাতকোটি কম্বল এসেছিল। সেই কম্বল গেল কোথায়?"

দেশময় বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়লো সহসা। চারিদিকে অভাব আর দারিদ্র গ্রাস করলো। দেখা দিলো দুর্ভিক্ষ। পথে ঘাটে মানুষ না খেয়ে মরতে লাগলো। জঠর জ্বালায় বাবা তার সন্তানকে বিক্রি করতে বাধ্য হলো। মা তার কোলের অবোধ শিশুকে খেতে দিতে না পেরে সন্তানসহ আত্মহত্যা করলো, কাপড় কিনতে না পেরে বাসন্তীরা জাল দিয়ে লজ্জা নিবারন করতে বাধ্য হলো। পথের ধারে মানুষের বমি খাবার জন্য মানুষে-কুকুরে প্রতিযোগিতা হতে লাগলো। পিতা মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেটটা আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন। উবে যেতে লাগলো সোনার বাংলার স্বপ্ন। উবে যেতে লাগলো গনতন্ত্রের স্বপ্ন। ক্রমেই দু:স্বপ্নের মতো আমাদের ঘাড়ে চাপতে লাগলো স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্র। সবকটি পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলো। চালু থাকলো সরকারের মুখপত্র চারটি মাত্র পত্রিকা। সবদল নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। সবাইকে একনেতা, একদেশ এর দীক্ষা দিয়ে বাকশাল করতে বাধ্য করা হলো। পরমত সহিষ্ণুতার পরিবর্তে ভিন্নমতাবলম্বীদের হত্যা করা হলো। ত্রিশ হাজার যুবক জীবন দিলো রাজপথে। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সরকার প্রধান সদর্পে ঘোষনা দিলেন- কোথায় সিরাজ সিকদার? এক অসহ্য গুমোট আবহাওয়া বিরাজ করতে লাগলো সর্বত্র। আমাদের সাহসী ছড়াকাররা বাধ্য হয়ে লিখলেন

" ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না বলা যাবে না কথা
রক্ত দিয়ে পেলাম শালার এমন স্বাধীনতা।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার- সবকিছু থেকে বঞ্চিত মানুষ মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছিল। এমনি সময়ে সরকার প্রধান স্বপ্ন দেখেছিলেন- একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করে

www.pathagar.com

দেশকে চিরতরে পরিবারতন্ত্রের বাধনে বাঁধতে, আর মানুষ স্বপ্ন দেখছিলো- বাঁচার মত বাঁচতে।

আবারও স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। সপরিবারে নিহত হলেন- দেশ ও জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা। তার সমস্ত স্বপ্ন মাটিতে মিশে গেলো। দেশ বেঁচে রইলো, তিনি চলে গেলেন। এতবড় দোর্দন্ড প্রতাপ শাসকের মৃত্যুতে পরদিন জনতার কোন মিছিল, সমাবেশ হলো না। কেউ কাঁদলো না। বরং তাঁর কোন কোন সঙ্গী নতুন মন্ত্রীসভায় সদস্য হলেন। এভাবেই স্বপ্ন ভঙ্গ হলো একদলের। আবার স্বপ্নে বিভোর হলো জনগন। নতুন স্বপ্ন। নতুনের স্বপ্ন।

চার. প্রতিবিপ্লবীদের স্বপ্ন সমাহিত হল

পঁচাত্তর এর ১৫ই আগস্ট অবিশ্বাস্য রকম এই পট পরিবর্তনে সাধারণ মানুষ এক ধরনের দুই ভাবনায় পড়ে গেলো। আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত নতুন সরকার দেশ গুছিয়ে আনতে না আনতেই একদল সামরিক কর্মকর্তা একটি প্রতিবিপ্লবের প্রয়াস নেয়। সেই বিপ্লবের নায়কেরা ছিলো দেশদ্রোহীদের প্রেতাত্মা। তাদের প্রয়াস ছিল অণশাসনকে ফিরিয়ে আনা কিন্তু সে দুষ্টস্বপ্ন সফল হয়নি।

৩রা নভেম্বর এই যখন ব্যারাকের চিত্র। ৪ঠা নভেম্বর বাইরে পরাজিত দলের পলাতক নেতারা রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিয়ে আবির্ভূত। জনতা চিনতে ভুল করেনি। ভুল করেনি সাহসী সেনারাও। ৭ই নভেম্বর প্রতিবিপ্লবীদের প্রতিহত করে সৈনিকেরা বেরিয়ে আসে জনতার মাঝে। সাত সকালে রাস্তায় রাস্তায় উল্লসিত জনতার মিছিল। ভয়ংকর ট্যাংকের পার্শ্বে অকুতোভয় জনতা এসে স্থান করে নিল। ফুল ছড়িয়ে দিলো সৈনিকের প্রতি। সারা ঢাকা মুখরিত হয়ে উঠলো 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে। এভাবেই সেদিন প্রতিবিপ্লবীদের স্বপ্ন সমাহিত হলো, প্রাণ ফিরে পেলো সাধারণ জনতা।

www.pathagar.com

পাঁচ. বারবার দল বদলায়, বদলায় না জনতার ভাগ্যলিপি

১৯৭৭ থেকে ৮১ পর্যন্ত জনতার ভালবাসা, মমতা ও দরদ লাভ করে দেশে গড়ে উঠে একটি জনপ্রিয় সরকার। বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে এলো, বিদেশে ভাবমুর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলো, তৃতীয় বিশ্বের একটি ছোট্ট দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ বেশ গুরুত্ব পেতে লাগলো। মনে হচ্ছিল আমরা যেনো আবারো স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। বড় হবার স্বপ্ন, মাথা উঁচু করার স্বপ্ন। আরবের মুসলমানরা আবার আমাদের ভাই বলতে লাগলো। আমরা ওদের পাশে বসতে লাগলাম।

১৯৮১র ৩০ শে জুন, আবার আমাদের আকাশে কালো মেঘ দেখা দিল। রাতের নিস্তব্দতা খান খান করে গর্জে উঠলো হায়েনার অস্ত্র। সিঁড়ির পাশে পড়ে থাকলো 'রাখাল প্রেসিডেন্টের' নিথর দেহ। শায়কের পাষাণ হৃদয় সামান্য কম্পিত হলো না। লাখো জনতার উপচে পড়া ভিড়ের মাঝে আওলাদে রাসুল কেঁদে বুক ভাসালেন- "মানুষটি কেমন ছিলো? খুব ভালো ছিল। আল্লাহ তুমি তাকে কবুল করে নাও।" গায়েবানা জানাজা পরিণত হলো জনসমুদ্রে।

এবার একজন বিচারপতি প্রেসিডেন্ট হলেন। সুশাসনের দিকে চলছিলো দেশ। হঠাৎই আমাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সেনাপ্রধানের চাপের কাছে মাথা নিচু করতে বাধ্য হলেন। বন্দুকের নল হলো তার ইচ্ছার প্রভু।

তারপর ১৯৮২ থেকে ১৯৯১।

নয়-নয়টি বৎসর আমরা এক দু:সহ স্বৈরশাসনের কবলে পড়লাম। সেনাপ্রধান-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হলেন, অত:পর প্রেসিডেন্ট হলেন। দল ভেঙ্গে নতুন দলের জন্ম দিলেন। তাঁকে ঘিরে আবার কয়েকশ পরিবার তৈরী হলো। গণতন্ত্রের জন্য অনেকেই জীবন দিলো। জীবন দিলো সেলিম দেলোয়াররা। অকালে ঝরে গেলো জাফর জাহাঙ্গীর, বাকীউল্লা, আমীর হোসেন আর হাফেজ আব্দুর রহিমরা। হায়েনার বুলেটে

www.pathagar.com

ঝাঁঝরা হলো 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লেখা সাহসী যুবক নূর মোহাম্মদের সুঠাম দেহ। মানুষ তার শাসন, শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য এক চাপা বিক্ষোভ জেগে উঠলো সর্বত্র। সরকার প্রধান মানুষের সুপ্ত আবেগকে সঙ্গী করার ইচ্ছায় স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এক একটি মসজিদে জুমআ পড়তে গিয়ে প্রায়ই বলতেন- "কালরাত স্বপ্নে দেখলাম- আপনাদের এই মসজিদে নামাজ পড়ছি, তাই চলে এলাম।" মানুষেরা চোখ ছানাবড়া করে বিস্মিত হলো। তিনি বাহবা নিয়ে চলে গেলেন। অথচ এই মসজিদটিতে হয়তো এক সপ্তাহ ধরে সরকারী লোকেরা আনাগোনা করছিলো তার সফর সফল করার জন্য।

অবশেষে ছাত্র-জনতার নয় বৎসরের আন্দোলন সফল হলো। স্বৈরাচারের পতন হলো। বাংলাদেশ লাভ করলো একটি 'কেয়ার-টেকার সরকার' সম্পূর্ণ নতুন এক ধারনা। আবারো স্বপ্নে বুক বাধলো মানুষ। ১৯৯১ থেকে ২০০২। ইতোমধ্যে তিনটি নির্বাচনে ভিন্ন ভিন্ন সরকার কায়েম হলো। একবার মানুষ ভোট দিলো ধানের শীষে জাতীয়তাবাদী সরকার কায়েম হলো। সরকার বেখেয়ালী হলো। সরকারকে পদে পদে বাধা দিতে লাগলো বিরোধী দল। শেষ পর্যন্ত সরকারকে নামতে হলো ক্ষমতা থেকে। আবারও কেয়ার টেকার সরকার। আবারও নির্বাচন। এবার নৌকা জিতলো।

দুর্নীতি, দুর্দশা ও দুষ্কামে ভরে উঠলো দেশ।

সরকার প্রধান স্বপ্ন দেখতে দেখতে অস্থির হয়ে গেলেন। আর সকল বিষয়ে এত অজস্র স্বপ্ন তিনি দেখলেন- আমরা একেবারে স্বপ্নভরাক্রান্ত হয়ে গেলাম।

অবশেষে আমাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

ট্রান্সপেরেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়ে দিলো- আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন। আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে আমরা বিশ্বের

www.pathagar.com

দরবারে একেবারে ছোট হয়ে গেলাম। এলো ২০০১ এর নির্বাচন। ১লা অক্টোবর ঘটে গেল একটি নীরব ব্যালট বিপ্লব। ভোটারদের এক অঘোষিত লড়াই হলো নব্য স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। শেষাবধি জনতারই জয় হলো। নতুন এক ফর্মুলায় তৈরী হলো জোট সরকার। বারবার ক্ষমতার হাত বদলায়, বদলায় না সাধারণ মানুষের ভাগ্যলিপি। ৬০ মন্ত্রীর বিশালবহর, দলীয় লোকদের উৎপাত, দেশের সকল সেক্টরে হতাশা, দুর্নীতিকর দুষ্ট ক্ষত-সবকিছু মিলিয়ে মানুষ খুব কষ্টে আছে। সাধারণের কষ্ট যেন আর কমতে চায় না। সাধারণ মানুষ মুক্তির স্বপ্ন দেখে, কিন্তু স্বপ্ন রয়ে যায়। চাল-ডাল-তৈল আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশ ছুঁই ছুঁই। কোথাও সুখ নেই, শান্তি নেই্ অসুখ-অশান্তির কারণ বর্নিত হলো। ঠিক দুর্নীতিই যেনো এক বড় ক্যান্সার, নীরব ঘাতক। কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়ে ফেলছে আমাদের। দুর্নীতির দুষ্ট ক্ষত থেকে দেশ ও জাতিকে উদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার শক্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। অপারেশন ক্লিন হার্ট, চলছেনা। অনেক জায়গাতেই সুনসান হয়ে গেছে সবকিছু। গা ঢাকা দিয়েছে দাগী সন্ত্রাসীরা, গড ফাদাররা। কেউ কেউ ধরা পড়ছে। আসল আসামীরা কিন্তু যথাস্থানে পালিয়ে গেছে।

এভাবে সব ক্লিন সম্ভব হলেও হার্ট ক্লিন করা সম্ভব নয়। অথচ আজ দরকার অসংখ্য ক্লিন হার্টের, বিশুদ্ধ চিত্তের। কোথা পাব আমরা সেই বিশুদ্ধ চিত্তের মানুষদের যারা অর্থ ও বিত্তের কাছে বিক্রি যাবে না, সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করবে না।

২০০৬-এর ২৮ শে অক্টোবরের মত কলঙ্কজনক অধ্যায় যুক্ত হলো আমাদের ইতিহাসে। অসাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সামরিক শাসকদের নব্যরূপ, নতুন লুটেরা শক্তি বাইরের দুর্নীতি বিরোধী লেবাস দিয়ে জনগনকে প্রতারিত করলো। শেষ অবিধি জয় হলো দেশ-জনতার, হলো ২০০৮ এর ২৯শে ডিসেম্বর নির্বাচন। আবার নির্বাচিত হলো আওয়ামী সরকার।

www.pathagar.com

আজ চলছে ডিজিটাল বাংলার স্বপ্ন। তারই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দুর্নীতি, দলীয়করণ ও অসহিষ্ণুতার প্রবণতা।

ছয়. তবুও স্বপ্ন দেখি, তবুও বাঁচতে শিখি

এতো হতাশা ও দু:খ কষ্টের মাঝেও আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে, বাঁচতে শিখতে হবে। কারণ যারা স্বপ্ন দেখে না তারা বাঁচতে শিখে না। আমরা স্বপ্ন দেখেই ক্ষ্যান্ত হবো না। মানুষের মনে আমাদেরকে স্বপ্নের ভিত্ রচনা করে দিতে হবে। ১৯৬৭ সালের দুর্গত ও নি:স্ব সিঙ্গাপুর আজ পৃথিবীতে একটি ক্ষুদ্র অথচ উন্নত দেশ। স্বপ্ন তাদেরকে বড় করেছে।

মালয়েশিয়ার মানুষেরা সর্বত্র হৈচৈ করছে তাদের নতুন স্বপ্ন নিয়ে। স্বপ্ন ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের সংকল্প ইতোমধ্যেই তাদেরকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছে। এখনও তারা স্বপ্ন দ্যাখে দুয়ো পুলো দুয়ো পুলো অর্থাৎ ২০২০। দুই হাজার বিশ সাল। দুই হাজার বিশ সালের মাঝে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে তারা পৃথিবীর নেতৃত্ব নিয়ে নিতে চায়। গায়ের জোরে নয়, অসির বলে নয, মেধা ও মসির বলে তারা পৃথিবীকে সামনে এগিয়ে নিতে চায়।

এই যে স্বপ্ন, এই যে বড় হওয়ার তাগিদ- এটিই আমাদের চলার পথের পাথেয়। ওদেরও তাই। একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে- আরেকটি নতুন পৃথিবী গড়বার জন্য যে উদার হৃদয় ও গভীর প্রজ্ঞার প্রয়োজন সেটি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে তরুণ প্রজন্মকে। তরুণরা এসো স্বপ্ন দেখি। অজস্র স্বপ্নের ভিড়ে আমরা সৃষ্টিশীলতার মাঝে হারিয়ে যাই।

আমাদের স্বপ্ন-আত্মগঠনের স্বপ্ন, নিজেকে গড়ার স্বপ্ন। নিজকে গড়া মানেই মানব সভ্যতার বিশাল ইমারতের একটি ইটকে ঠিক ঠিকমত গেড়ে দেয়া।
আমাদের স্বপ্ন-পরিবার গঠনের স্বপ্ন। মা, বাবা, ভাই, বোনসহ সকল আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে আমরা গড়বো এক একটি শিক্ষিত পরিবার, সৎ

www.pathagar.com

পরিবার, সাহসী পরিবার। কারণ এই পরিবারগুলোই সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থার একক।

আমাদের স্বপ্ন-সমাজ গঠনের, সমাজ বদলের স্বপ্ন। ঘুণে ধরা সমাজকে ভেঙ্গে নতুন এক সমাজ গঠনের স্বপ্ন।

আমাদের স্বপ্ন-একটি দেশ ও রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন। আশা ও সৃজনশীলতায় ভরা একটি দেশ গড়বো আমরা।

এই যে দেশ, এই যে মাটি, ৫৬০০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তীর্ণ সবুজের এই যে সমারোহ; এটিই আমাদের সেই স্বপ্নের সাহসী ঠিকানা। এই ঠিকানায় জড়ো হই, জেগে উঠি সৃষ্টি, কল্যাণ ও উন্নতির নতুন উদ্যম নিয়ে- "আগুনের ফুলকিরা এসো জড়ো হই দাবানল জ্বালবার মন্ত্রে, বজ্রের হুংকারে আঘাত হানি মিথ্যার সব ষড়যন্ত্রে।"

www.pathagar.com

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম অফিসঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

www.pathagar.com